



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২৫



Date 01/08/2023

মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি, আমি নিজেকে আবু আর্টিকিল্যু
বুঝত মাবলাম না, যদি আবুজান, তোমার কথা অমান্ত
কেবে বেব হোলাম, স্বার্থপত্রে মতো বাবে বাসে আকত
দ্বারলাম না, আমাদ্বাৰ ডাই বু আমাদ্বাৰ ডিবিয়ও প্ৰজন্মেৰ
জন্য কোয়ন্তেৰ কাপড় মাথায় ধেৰে যাজপথে নেমে সংগ্রাম
কেবে যাচ্ছি, অৱগতবৈ নিষ্ঠাবৈ জীৱন বিষ্ণুন মিছু, একটি
প্ৰতিবন্ধি কি঳োৱ, ৭ বছৱেৰ বাবু, ল্যাঙ্গু মানুষ যদি সংগ্রাম
বাগত পাৰে, তাহলে আমি কেৱো কোমে আকতো ঘৰ্জি, একদিন
তা মৰতে হৰেই, ভাই শুভ্যু ডয় কেবে স্বার্থপত্রে মতো শুব্রে
কেমে না থেকে সংগ্রামে নেমে শুলি ধেয়ে বীৱেৰ মতো শুভ্যু
অধিক গ্ৰেষ্টি, যে অন্তৰ জন্য নিজেৰ জীৱনকে বিলিয়ে দৰ্জ
মৰ্হি প্ৰহৃত মানুষ, আমি যদি কেচ না ফিৰি তবে কৰ্ষণ না
দৈয়ে পৰিজ হয়ো, জীৱনৰ প্ৰতিটি ছুলেৱ জন্য ক্ষমা চাৰি।

আনাম

Apetiz

উৎসর্গ

চৰিশেৱ জুলাই-আগস্টেৱ গণঅভূজখানে প্ৰাণ উৎসৱকাৰী জুলাই শহিদ আনাসসহ
অন্যান্য জুলাই শহিদ ও অসম সাহসী জুলাই যোদ্ধাদেৱ উদ্দেশ্যে এই প্ৰতিবেদনটি
আমৱা উৎসৱ কৰছি।

* পূৰ্বেৱ পৃষ্ঠাৱ চিঠিটি চৰিশেৱ জুলাই-আগস্টেৱ
গণঅভূজখানে নিহত শহিদ আনাসেৱ মায়েৱ কাছে লেখা শেষ চিঠি।

প্রকাশক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রাচ্ছদ

চবিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত গ্রাফিতি চিত্র আলোকে

মুদ্রণ সমন্বয়

মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বর্ণ বিন্যাস

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাঁধাই

বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ

বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

* এই বইয়ের কোনো কপিরাইট নেই। যে কেউ
কোনোরকম পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন ছাড়া
থিবেদনের মূল লেখা প্রকাশ ও বিতরণ করতে পারেন।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠার মাধ্যমে। এই অভ্যুত্থানের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশে এমন এক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে সকলের অধিকার সুনির্ণিত হবে, কোনও ব্যক্তি বা দল দেশের মানুষের জীবন ও দেশের সম্পদ নিয়ে ছিনমিনি খেলতে পারবেনা, সকলের ভোট দেবার অধিকার আর কোনও দিন লুণ্ঠিত হবে না এবং নাগরিকদের সম্মতিতে দেশ পরিচালিত হবে। দেশ পরিচালনার এই পদ্ধতি তৈরি করতে হলে দরকার বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার।

জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের বীর শহিদরা, যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের আত্মানের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারের দায়িত্ব আমাদের সকলের ওপরে অর্পণ করেছেন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এইসব কমিশনের সদস্যরা নিরলস পরিশ্রম করে সংস্কারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন। কমিশনগুলোর এইসব প্রতিবেদন মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্ষিত হবে। এখান থেকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কতটুকু গ্রহণ করবো, কোনটা কখন কাজে লাগাতে পারবো, কীভাবে অগ্রসর হবো তা নির্ধারণের জন্যে দরকার দেশের সব মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। সে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে গঠিত সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন এবং পুলিশের সংস্কার বিষয়ক কমিশনগুলোর প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করা হল।

জুলাই অভ্যুত্থানে যাঁরা আত্মাহতি দিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতি ছিল একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ-দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। এখন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত হোক এবং মসৃণ হোক এই কামনা করে এই সুপারিশমালা দেশবাসীর নিকট তুলে দিলাম।



প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস

প্রধান উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় কমিশন প্রধানের ভূমিকা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ সংঘটিত ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থানের ফলে দেশের জনগণের মধ্যে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আলোকে রাষ্ট্র সংস্কারের একটি সুদৃঢ় প্রত্যয় ও আকাঞ্চ্ছা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করেছেন; এর মধ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন অন্যতম। একটি জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, নিরপেক্ষ ও দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্য এ কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কমিশন তার সুপারিশ প্রণয়নের আগে অতীতে বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংক্রান্ত যে সব সংস্কার কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করেছে। একইভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে জনপ্রশাসন সংস্কারের অভিজ্ঞতাগুলোও পরীক্ষা করে দেখেছে। এরপর ঢাকা এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সফর করে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় এবং অনলাইনে তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে। কমিশন সংস্কারের অংশ হিসেবে জনপ্রশাসনের রূপকল্প (vision) হিসেবে নির্ধারণ করেছে "প্রজাতন্ত্রের সর্বস্তরে নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য সুশাসন (good governance) প্রতিষ্ঠা করা"।

কমিশন জনপ্রশাসনের মূলনীতি (core value) হিসেবে জনবান্ধব, নেতৃত্ব, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে চিহ্নিত করেছে। অপরদিকে, লক্ষ্য হিসেবে "প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে নাগরিক সেবা প্রদান করা"-কে নির্ধারণ করেছে। কমিশন মনে করে যে, জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য নীতি-নির্ধারক ও আমলাদের মনোজাগিতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সংস্কার হওয়া একটি পূর্বশর্ত। এ জন্য সরকারি কর্মচারীদের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ ও উদ্বৃদ্ধকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসনের প্রধান কাজই হচ্ছে নাগরিকদের সেবা প্রদান করা। কমিশন বিষয়টির উপর গুরুত্বারূপ করে ই-গভর্ন্যান্স কার্যকরভাবে প্রবর্তন, তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করে অধিকতর জনবান্ধব করা এবং 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সুপারিশ করেছে।

দেশে বিদ্যমান এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ রয়েছে তার কাঠামোগত ও কার্যাবলী সংক্রান্ত সংস্কার অত্যন্ত যৌক্তিক বিবেচনা করা হয়েছে। তার আলোকে মন্ত্রণালয় সংখ্যা হ্রাস, মন্ত্রণালয়গুলোকে বিভিন্ন গুচ্ছে বিভক্তিকরণ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু, রাজধানীকে নিয়ে মহানগরীয় সরকার গঠন, দুইটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি, জেলা পরিষদ বাতিল, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়েছে।

অপরদিকে, জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়ে বিদ্যমান যে ২৬টি সার্ভিস ক্যাডার রয়েছে তা বাতিল করে সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ১৪টিতে বিন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া সচিবালয়ের উপসচিব ও তদুর্ধ পদগুলোর জন্য 'সুপারিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস' নামে একটি শীর্ষ সার্ভিস গঠনের কথা বলা হয়েছে। কমিশন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের জনপ্রশাসনের বিষয়গুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দুটি ভিন্ন অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নারী-বান্ধব কর্মপরিবেশ বিষয়গুলোকে

বিশেষভাবে বিবেচনা করে কতিপয় সুপারিশ পেশ করেছে। পরিশেষে, কমিশন সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কিছু কৌশলের উপর আলোকপাত করে আশা করে যে, এসব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে একটি গুণগত পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের উপর অর্পিত কাজগুলো বেশ ব্যাপক ও শ্রমসাধ্য ছিল। সীমিত সময়ের মধ্যে এগুলো সম্পাদন করা ছিল অত্যন্ত দুর্ক্ষ। এতদসত্ত্বেও কমিশন সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অংশীজনদের সহায়তায় প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি এ জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে সকল সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মকর্তা এবং মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী সকল নাগরিকদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া আমি ব্যক্তিগতভাবে কমিশনের সকল সদস্য ও সহায়তাকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) ও সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-এর যে সকল ব্যক্তি নানাভাবে কমিশনের কাজে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে কমিশনের এ প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। কমিশনের এই সংক্ষিপ্ত ভাসনে কিছু সংযুক্তি ও সকল পরিশিষ্ট পরিহার করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিবেদনের কলেবর প্রায় এক-ত্রৈয়াংশ আকার লাভ করেছে। এতদসত্ত্বেও এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন থেকে কমিশনের মূল সুপারিশগুলো সম্পর্কে দেশের জনগণ জানতে পারবেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে যথার্থ কাজই করেছে।

আবদুল মুয়াদ চৌধুরী

কমিশন প্রধান, এবং

সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

(জ্যোষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ড. মোহাম্মদ তারেক
সদস্য, এবং
সাবেক সচিব

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া
সদস্য, এবং
সাবেক সচিব

ড. মো: মোখলেস উর রহমান
সদস্য, এবং
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ড. মো: হাফিজুর রহমান ভুঞ্জা
সদস্য, এবং
সাবেক অতিরিক্ত সচিব

ড. রিজওয়ান খায়ের
সদস্য, এবং
সাবেক যুগ্মসচিব

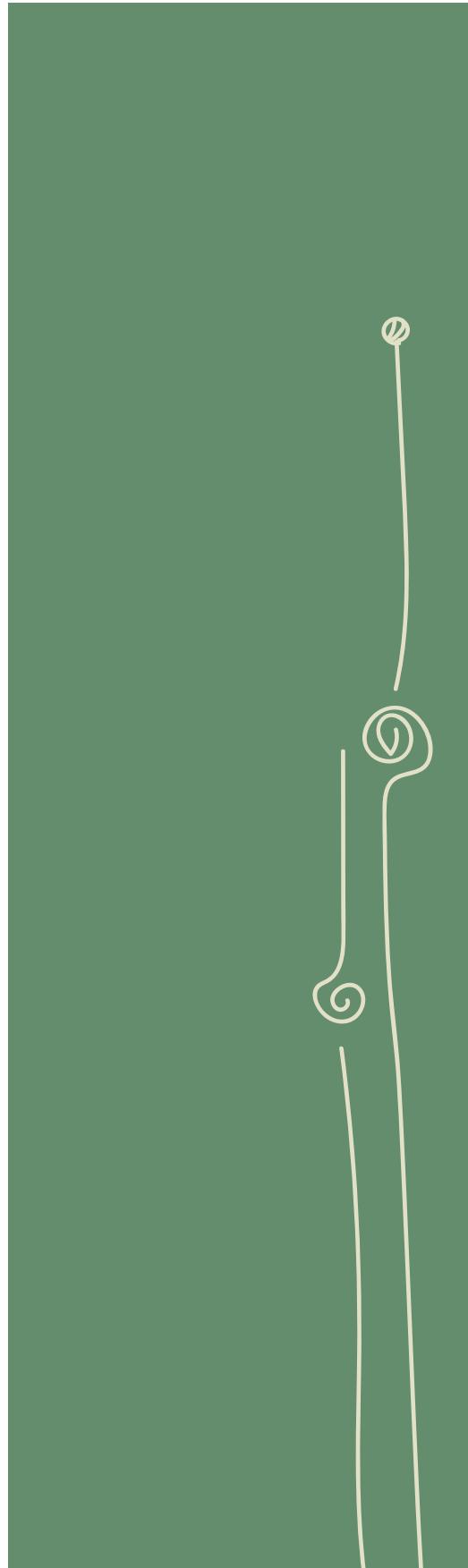
অধ্যাপক আকাব ফিরোজ আহমদ
সদস্য, এবং
সাবেক চেয়ারম্যান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ডা. সৈয়দা শাহীনা সোবহান
সদস্য, এবং
সাবেক পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিক্যাল এডুকেশন

ফিরোজ আহমেদ
সদস্য, এবং
সাবেক মহাপরিচালক, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

খোন্দকার মোহাম্মদ আমিনুর রহমান
সদস্য, এবং
সাবেক সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মেহেদী হাসান
সদস্য, এবং
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্র প্রতিনিধি)



জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

এই প্রতিবেদনটি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক
জমা দেওয়া প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত সংক্রান্ত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	ভূমিকা	১-৩
অধ্যায়-২	বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংস্কারের যৌক্তিকতা	৪-১০
অধ্যায়-৩	জনপ্রশাসনের রূপকল্প, মূলনীতি, লক্ষ্য ও নেতৃত্ব	১১-১২
অধ্যায়-৪	জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের আচরণগত সংস্কার	১৩
অধ্যায়-৫	নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নে জনপ্রশাসন	১৪-১৬
অধ্যায়-৬	জনপ্রশাসনের প্রার্থীনিক ও কাঠামোগত পুনর্গঠন (মন্ত্রণালয়/দণ্ডের পুনর্বিন্যাসকরণ)	১৭-২২
অধ্যায়-৭	সিভিল সার্ভিসের কাঠামো ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার	২৩-৩১
অধ্যায়-৮	জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কার	৩২-৩৮
অধ্যায়-৯	জনপ্রশাসনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য সংস্কার	৩৯-৪১
অধ্যায়-১০	জনপ্রশাসনের নৈপুন্য বিকাশ ও সক্ষমতার উন্নয়ন	৪২-৪৩
অধ্যায়-১১	কর্মদক্ষ জনপ্রশাসনের জন্য সংস্কার	৪৪-৪৬
অধ্যায়-১২	জনপ্রশাসনে কার্যকারিতার লক্ষ্য সংস্কার	৪৭-৪৯
অধ্যায়-১৩	বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস সংস্কারে বিশেষ সুপারিশমালা	৫০-৫৪
অধ্যায়-১৪	বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস সংস্কারে বিশেষ সুপারিশমালা	৫৫-৫৯
অধ্যায়-১৫	পার্বত্য এলাকার জনপ্রশাসন সংস্কারে বিশেষ সুপারিশ	৬০-৬১
অধ্যায়-১৬	জনপ্রশাসনে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে সংস্কার প্রস্তাব	৬২
অধ্যায়-১৭	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের কৌশল	৬৩-৬৪
	উপসংহার	৬৫-৬৬
	সংযুক্তি	৬৭-৭৭

অধ্যায় এক
ভূমিকা

ক। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনের পটভূমি

বিগত ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারীকৃত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও নিরপেক্ষ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে “জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন” নামে নিম্নরূপ একটি কমিশন গঠন করে (সংযুক্তি-১) কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন নিম্নরূপঃ

১.	আবদুল মুয়াদ চৌধুরী, সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার	কমিশন প্রধান
২.	ড. মোহাম্মদ তারেক, সাবেক সচিব	সদস্য
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সাবেক সচিব	সদস্য
৪.	ড. মো: মোখলেস উর রহমান, সিনিয়র সচিব	সদস্য-সচিব
৫.	ড. মো: হাফিজুর রহমান ভূঞ্চা, সাবেক অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
৬.	ড. রিজওয়ান খায়ের, সাবেক যুগ্মসচিব	সদস্য
৭.	অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমদ, সাবেক চেয়ারম্যান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮.	মেহেদী হাসান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্র প্রতিনিধি)	সদস্য

বিগত ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত আরেকটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে কমিশন পুনর্গঠন করা হয় (সংযুক্তি-২)ঃ

১.	প্রফেসর ডা. সৈয়দা শাহীনা সোবহান, সাবেক পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিক্যাল এডুকেশন	সদস্য
২.	ফিরোজ আহমেদ, সাবেক মহাপরিচালক, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়	সদস্য
৩.	খোদকার মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, সাবেক সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য

কমিশনকে ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যক্রম শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকল মতামত বিবেচনা করে পরবর্তী ৯০ (নবই) দিনের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করার জন্য বলা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে কমিশনের প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ ৩১ জানুয়ারী ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

খ। কমিশনের কর্মপরিধি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনকে (ক) জনমুখী, (খ) জবাবদিহিমূলক, (গ) দক্ষ এবং (ঘ) নিরপেক্ষভাবে পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রক্রিয়া দেয়া হয়। প্রস্তাবিত জনপ্রশাসনের উল্লিখিত চারটি লক্ষ্যের দিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটা স্পষ্ট যে, জনপ্রশাসনকে জনবাস্তব করা এবং তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার সাথে আরো কিছু বিষয় অঙ্গসংমিলিত জড়িত। বস্তুতপক্ষে জনপ্রশাসনকে জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ এবং নিরপেক্ষ হিসেবে পুনর্গঠনের পাশাপাশি তাকে কার্যকর এবং কর্মকুশলী করেও গড়ে তুলতে হবে। একইভাবে দক্ষ প্রশাসনের লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সঠিক কৌশলগত প্রশাসনিক নেতৃত্বের বিকাশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উপরে উল্লিখিত চারটি লক্ষ্যকে সম্প্রসারিত করে জনপ্রশাসনকে আরো কার্যকর ও পরিষেবায় কর্মকুশল করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সার্বিকভাবে জনপ্রশাসন সংস্কারের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত ছয়টি লক্ষ্যকে বিবেচনা করেছে: ক) জনমুখীতা, (খ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, (গ) জনপ্রশাসনের কর্মকুশলতা ও সক্ষমতা, (ঘ) নিরপেক্ষতা, (ঙ) জনপরিষেবায় দক্ষতা এবং (চ) জনপ্রশাসনের কার্যকারিতা।

গ। প্রতিবেদন প্রণয়নের পদ্ধতি

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ প্রণয়নের একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর অন্যতম হচ্ছে, বাংলাদেশে অতীতের সংস্কার প্রচেষ্টা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাম্প্রতিক জনপ্রশাসনের সংস্কার কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা করা। এছাড়া সরকারি, বেসরকারি, সুশীল সমাজ, এনজিও কর্মকর্তা এবং নাগরিকদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অংশীজনদের সাথে আলাচনা ও সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন বিষয়ে কেস স্টাডি/সমীক্ষা বিশ্লেষণ ও তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে তথ্যের ধরন, উৎস, বিশ্লেষণের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে:

- ১) সংগৃহীত তথ্যের ধরনঃ গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত ডেটাতে সাক্ষাৎকার, কেআইআই, ফোকাস গ্রুপ এবং কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পরিমাণগত তথ্য জরিপ এবং কাঠামোগত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ২) তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন উৎসঃ (ক) সরকারি, বেসরকারি খাত, এনজিও এবং সিএসও সংস্থাসমূহের মতামত, ডকুমেন্ট এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থায় কর্মরতদের মতামত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; (খ) সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী, নাগরিক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতামত সংগ্রহের জন্য জরিপ পরিচালনা; (গ) কেআইআই এবং ফোকাস গ্রুপগুলোর সাথে সাক্ষাৎকার; (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাণ্ত গবেষণা প্রতিবেদন; (ঙ) বিভিন্ন দেশের কেস স্টাডি; (১) সংবাদ, নিবন্ধ ও প্রতিবেদন; এবং (৮) আইন, প্রবিধান এবং নীতিমালা।
- ৩) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ (ক) জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত পর্যালোচনা; (খ) মতামত সংগ্রহ- অসংগঠিত সাক্ষাৎকার; (গ) জরিপ এবং কাঠামোগত প্রশ্নাবলী; (ঘ) মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই) এবং এফজিডি তথা মূল অংশীজনদের সাথে সাক্ষাৎকার।
- ৪) তথ্য বিশ্লেষণঃ সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়ঃ (ক) থিম্যাটিক বিশ্লেষণ; (খ) পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ; (ঘ) বেঞ্চমার্কিং- যেমন সংস্কার ব্যবহাৰ, নীতি, সুপারিশ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ।

ঘ। অংশীজনের মতামত সংগ্রহে সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম

কমিশন সমাজের বিভিন্ন প্রাকারের অংশীজনের মতামত সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেঃ

- ১) জনপ্রশাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনমত সংগ্রহের জন্য অনলাইনে প্রশ্ন জারি করা হয় এবং মোট ১,০৫,০০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) নাগরিকের অভিমত পাওয়া যায়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্যগুলো প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তার ফলাফল বিবেচনায় রেখে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২) কমিশন পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি দণ্ডের নাগরিকরা কী কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন তার একটি জরিপ করা হয়েছে। এতে মোট পাঁচ হাজার নাগরিক অংশগ্রহণ করেন।
- ৩) বর্তমান প্রজমের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত জনপ্রশাসনকে কীভাবে দেখতে চায় সেজন্য তাদের মধ্যেও কমিশন একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এতে প্রায় ৯৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।
- ৪) তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের সাথে কমিশন সদস্যদের মতবিনিময় হয়। এ উদ্দেশ্যে কমিশন চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ চারটি বিভাগের নিম্নলিখিত ৭টি জেলা ও ৫টি উপজেলা সফর করে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও বয়সের প্রায় পাঁচ হাজার নাগরিক ও বিভিন্ন দণ্ডের সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিলেন।

ক্রমিক	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মন্তব্য
১.	ঢাকা	ফরিদপুর	শিবচর	
২.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কুমিল্লা ও চাঁদপুর	মতলব	রাঙামাটির সভায় চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও ইউএনও-গণ উপস্থিতি ছিলেন।
৩.	রাজশাহী	রাজশাহী, নাটোর	পুটিয়া	রাজশাহীর সভায় উক্ত বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও সকল জেলা প্রশাসক উপস্থিতি ছিলেন।
৪.	খুলনা	খুলনা ও বাগেরহাট	রূপসা ও রামপাল	

- (৫) কমিশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) প্রশিক্ষণরত বিভিন্ন ক্যাডারের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা, সামরিক কর্মকর্তা, বিসিএস প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমীতে প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা তথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত ডিপুটি কমিশনার এবং বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) প্রশিক্ষণরত ৯টি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়ে একাধিক ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (Focus Group Discussion) অনুষ্ঠিত হয়।
- (৬) কমিশন ২৬টি ক্যাডারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়ে তাদের স্ব স্ব ক্যাডারের সমস্যা, প্রত্যাশা ও পরামর্শ তুলে ধরার অনুরোধ জানায় এবং তারা মৌখিক ও লিখিতভাবে তাদের পরামর্শ প্রদান করে। স্বাস্থ্য খাতের বিষয়গুলো জানার জন্য আলাদাভাবে সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।
- (৭) কমিশন ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)-এর নেতৃত্বদের সাথে মিলিত হয়ে জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ে তাদের পরামর্শ আহ্বান করে। চেম্বারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তারা কমিশনের সদস্যদের কাছে বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেন।
- (৮) কমিশন মিডিয়া তথা যে সকল সাংবাদিক সচিবালয়ে এসে নিয়মিত সংবাদ কভার করে তাদের সাথেও মতবিনিময় করে।
- (৯) কমিশন কর্তৃক জনপ্রশাসন সংস্কারের বিষয়ে লিখিত পরামর্শ আহ্বান করে ১৩ টি রাজনৈতিক দলের সম্মানিত সভাপতি ও মহাসচিবের কাছ চিঠি পাঠানো হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, আমার বাংলাদেশ পার্টি ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টি লিখিতভাবে তাদের পরামর্শ প্রদান করে।
- (১০) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন এবং কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন।

অধ্যায় দুই

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংস্কারের পটভূমি ও মৌকিকতা

ক। বাংলাদেশে জনপ্রশাসন সংস্কারের অতীত উদ্যোগসমূহ

পাকিস্তান আমল থেকে প্রাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামো ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রতুল। স্বাধীন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গগতির চাহিদা পূরণে ওই কাঠামো পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারের আমলে অনেকগুলো জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়। (পরিশিষ্ট-১) একমাত্র স্বাধীনতা লাভের পরপরই গঠিত (Civil Administration Restoration Committee (CAR) কমিটি ছাড়া সব কমিশন/কমিটি পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু সে সব সুপারিশসমূহের অধিকাংশই নানা কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি ১৯৭২ সালে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত Administration and Services Reorganization Commission (ASRC)-এর সুপারিশমালা অপ্রকাশিত ডক্যুমেন্ট হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

(১) **Administration and Services Reorganization Commission (ASRC):** ASRC-এর সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল সেবাসমূহের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারকে একত্রিত করার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার পরিকল্পনা। এতে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর করার সুপারিশ করা হয়, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে যায়। এছাড়া, সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে উন্নত ব্যবস্থা চালু এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত মেধাভিত্তিক পদোন্নতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এ কমিশনের কোনো সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়নি।

(২) **Pay and Service Commission (P&SC):** ১৯৭৫ সনে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনের চিরায়িত চরিত্র পুরোপুরি পাল্টে যায়। ওই বছরের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এক ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে ১৯৭৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এম. এ. রশিদের নেতৃত্বে প্রধানত প্রশাসন ও বেতন কাঠামো মৌকিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য Pay and Service Commission (P&SC) গঠন করা হয়। কমিশনের কাজ ছিল সিভিল সার্ভিসের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান এবং একটি কার্যকর ও মেধাভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা। কমিশন সিভিল সার্ভিসকে চারটি স্তরে যথা-শীর্ষ ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষজ্ঞ গ্রুপ, নির্বাহী এবং মিডেল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, পরিদর্শন ও কারিগরি গ্রুপ, এবং ব্যবস্থাপনা ও রক্ষাবেক্ষণ গ্রুপ-এ বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। এছাড়াও, ২৮টি ক্যাডার সার্ভিস গঠন, মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিকরণ, সিনিয়র সার্ভিস পুল গঠন এবং বেতন কাঠামো সরলীকরণের জন্য ৫২টি স্কেল প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। যদিও ২৮টি ক্যাডার এবং ২১টি বেতন স্কেল বাস্তবায়িত হয়েছে; তবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ, যেমন মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি এবং পৃথক সিভিল সার্ভিস মন্ত্রণালয় গঠন আজও বাস্তবায়িত হয়নি। রশিদ কমিশনের ওই প্রচেষ্টা একটি দূরদর্শী উদ্যোগ ছিল, যা বাংলাদেশের প্রশাসনকে আরও কার্যকর এবং জনমুখী করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারতো।

(৩) **Civil Administration Reform Commission (CARC):** ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনামলে গঠিত হয় Civil Administration Reform Commission (CARC)। এ কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের কাজগুলোর প্রক্রিয়াগত জটিলতা দূর করে দক্ষতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা। কমিশন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস এবং কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মকর্তাদের মূল্যায়নের প্রস্তাব দেয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে আলাদা আইন এবং নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশও করা হয়। কিছু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও দুর্নীতি দমন এবং মেধাভিত্তিক পদোন্নতি পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।

(৪) **Administrative Reorganization Committee (ARC):** ১৯৯৩ সালে প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গঠিত হয় Administrative Reorganization Committee (ARC)। প্রাক্তন সচিব এম. নুরুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে ওই কমিটি ১৯৯৬ সালে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। কমিটি মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৩৫ থেকে ২২-এ নামিয়ে আনার, ৪৭টি সংস্থা বিলুপ্ত করার এবং ন্যায়পাল (Ombudsman) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। তারা ধারণা করেছিলেন যে, এ সব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে প্রায় ১৭৪ কোটি টাকা সাম্প্রয় এবং ৪৬,২৭৬ জন সিভিল কর্মচারী অতিরিক্ত হবে। তবে, সরকারের পরিবর্তনের কারণে এ প্রতিবেদন বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি।

(৫) Public Administration Reform Commission (PARC): ১৯৯৭ সালে গঠিত Public Administration Reform Commission (PARC) ২০০০ সালে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। এ কমিশনের প্রধান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ. টি. এম. শামসুল হক। প্রতিবেদনে লোকপ্রশাসনের স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও New Public Management (NPM) তত্ত্বের আলোকে প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন এবং সেবা প্রদানের মান উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়। কমিশন তিনি ধরনের সুপারিশ প্রদান করে: অন্তর্ভুক্তি, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী। এ সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল পাবলিক অফিসের লক্ষ্য ও কার্যালী নির্ধারণ, সিভিল সার্ভিসে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলভিত্তিক কর্মক্ষমতা Annual Performance Agreement (APA), সরকারি সংস্থার আয়-ব্যয়ের বিবরণ নিরীক্ষা, অধ্যন ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরে ক্ষমতা হস্তান্তর, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সরকারি নথি ও প্রতিবেদনে উন্মুক্ত ও মুক্ত প্রবেশাধিকার, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা এবং পুরানো আইন, নিয়ম, বিধি ও ফর্মের সরলীকরণ। কমিশনের সুপারিশগুলো সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং কিছু অন্তর্ভুক্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং দুর্বীলি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে, যা পূর্বের দুর্বীলি দমন ব্যুরোকে পুনঃনামকরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৬) Regulatory Reform commission (RRC): ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ড. আকবর আলী খানের নেতৃত্বে গঠিত Regulatory Reform Commission (RRC) ছিল প্রশাসনিক কাঠামোকে গতিশীল ও কার্যকর করার এক সাহসী উদ্যোগ। ১৭ সদস্যের এ কমিশন বিদ্যমান আইন, উপবিধি ও সরকারি আদেশ পর্যালোচনা করে অপ্রয়োজনীয় বিধি বাতিল এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সরলীকরণের সুপারিশ করে। মোট ৪৯টি সুপারিশের মধ্যে প্রধান ছিল বাধ্যতামূলক Regulatory Impact Assessment (RIA) কাঠামো চালু করা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সহজতর করা। তত্ত্বাবধায়ক শাসনের কর্তৃত্ববাদী চরিত্র কিছু সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নে সহায় হলেও ২০০৯ সালে নতুন সরকার আসার পর কমিশন কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সরকারি সংস্থাগুলোর অসহযোগিতা এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে ৬০% সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। RRC-এর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেলেও এটি প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমষ্টিয়ের মাধ্যমে ওই সুপারিশগুলো কার্যকর করা হলে দেশের প্রশাসন আরও স্বচ্ছ, কার্যকর এবং জনমুখী হয়ে উঠতে পারতো।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতিটি উদ্যোগ দেশের সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমষ্টিয়ের ঘাটতি অনেক সুপারিশ বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ এবং দুর্বীলি দমন কমিশন গঠনের মতো কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বাস্তবায়িত হলেও, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এখনো অবাস্তবায়িত রয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার শুধু নীতিগত নয়, এটি একটি ধারাবাহিক এবং সমাজিত প্রক্রিয়া। জনগণের জন্য আরও স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল এবং কার্যকর প্রশাসন গড়ে তুলতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সাঠিক পদক্ষেপ নেওয়া গেলে, এ সংস্কারগুলো দেশের উন্নয়নের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

খ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জনপ্রশাসন সংস্কারের কার্যকর পদ্ধতি:

গত শতাব্দির শেষ দশকে নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (এনপিএম) ধারণার প্রভাবে বিশ্বজুড়ে পাবলিক সেক্টরগুলো একটি ঐতিহ্যবাহী 'টপ ডাউন মডেল' থেকে নাগরিককেন্দ্রিক, সংবেদনশীল, উভাবনী এবং নমনীয় পাবলিক সেক্টরে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তনগুলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উপনিবেশিক কাঠামোর অবশিষ্টাংশ থেকে সরে এসে আরও নাগরিক-বাস্তব এবং কার্যকর জনপ্রশাসনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সংস্কারকেও প্রভাবিত করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতি ব্যবস্থা কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোগ করা যেতে পারে। সর্বোত্তম দ্রষ্টব্যগুলো নিম্নরূপঃ

- (১) মালয়েশিয়াঃ মালয়েশিয়া সরকার সাতটি সেক্টরে পরিমেবা উন্নত করার জন্য একটি সরকারি কর্মসূচি (Government Transformation Program-GTP) শুরু করেছে দূষণ, শিক্ষা, গ্রামীণ অবকাঠামো, শহরে গণপরিবহন, দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জন্য সরকারের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা (National Key Performance Indicators-NKPI) নির্ধারণ করা হয়। এসব লক্ষ্য যাতে অর্জন করা যায় তা পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও উন্নত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। জিটিপির দিক-নির্দেশনামূলক নীতি ছিল অংশীজনদের মধ্যে নিয়মিত পরামর্শ করা। কারণ, এ নীতিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অংশস্থানে কর্মশালার মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হয়েছিল এবং তারা বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসহ সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়ে এসেছিলেন। জিটিপি বেসরকারি খাতের লোকসহ আন্তঃবিভাগীয় সমস্যা সমাধানকারী সংস্থাগুলোও চালু করেছিল এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল।

- (২) সিঙ্গাপুরঃ সিঙ্গাপুরে বেসরকারি খাতের চেয়ে সরকারি চাকরিতে ভাল বেতন এবং দুর্নীতির বিষয়ে শুন্য সহনশীল মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস রয়েছে। সেখানে সরকারি খাতের জনবলের মূল বৈশিষ্ট হলো মেধা, দক্ষতা এবং নাগরিকদের আরও ভালভাবে সেবা দেওয়ার জন্য দক্ষতা এবং জ্ঞানের ক্রমাগত আপগ্রেড করা এবং সরকারের মধ্যে দক্ষতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। একবিংশ শতাব্দীর জন্য পাবলিক সার্ভিস-২১ (Public Service-PS 21) নামে পরিচিত সংস্কারগুলোর দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিলঃ (ক) গুণগত মান, শিষ্টাচার এবং জনগণের চাহিদা পূরণে পরিমেবার শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব লালন করা; এবং (খ) দক্ষতার জন্য আধুনিক ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলো (যেমন ই-সরকার এবং গ্রাহক জরিপ) কার্যকর করা। পিএস-২১ এর লক্ষ্য এমন একটি পাবলিক সার্ভিস তৈরি করা যা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। এটি একটি জনমুঝী ব্যবস্থা যা সরকারি কর্মকর্তাদের ক্রমাগত জনসেবার মান উন্নতি করার জন্য তাদের দৈনন্দিন কাজে পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। এটি জনসেবার বাইরে মধ্য-কর্মজীবনে প্রবেশকারীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য একটি প্রশাসনিক সংস্কৃতি চালু করেছে যারা জাতির সেবা করতে আগ্রহী। পাবলিক সার্ভিসে একটি "মিড-ক্যারিয়ার লিডার্স ট্র্যাক" চালু করা হয়েছে যা পাবলিক সার্ভিস নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের সম্ভাবনা এবং আকাঞ্চন্দ্র মধ্য-ক্যারিয়ারে প্রবেশকারীদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বার। এ ধরনের নতুন প্রবেশকারীদের পাবলিক সার্ভিসের কমপক্ষে দুটি ভিন্ন খাতে অবেষণ এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাজের ঘূর্ণন কাঠামোর মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং তারপরে তারা একটি খাতের বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করে, বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে গভীর নেটওয়ার্ক তৈরি করে।
- (৩) ইন্দোনেশিয়াঃ দেশটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একটি কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেস্ট (Computer Assisted Test- CAT) চালু করেছে। ক্যাট মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা পরীক্ষা নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন চাকরির পদের ঘোষণাটি কোনো সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সরকারি কর্মচারীরা স্থায়ী কর্মচারী এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত এবং নিয়োগ ব্যবস্থা একটি মেধা ব্যবস্থার উপর ভিত্তির উপর তৈরি করা হয়েছে।
- (৪) দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশঃ থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া এবং মায়ানমারে বার্ষিক কর্মসূচিতে মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে এবং ভিয়েতনাম এবং লাও পিডিআর একটি পরীক্ষা বা পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি পর্যালোচনা কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হয়, যারা কর্মসূচিতা, দক্ষতা, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষীকৰণ, ক্যারিয়ারের ইতিহাস এবং কর্মসূচিতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করে।
- (৫) শ্রীলঙ্কাঃ শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ই-শ্রীলঙ্কা রোডম্যাপটি নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। তারা উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে আইসিটি ব্যবহার করে একাধিক ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করেছে। তারা একদিকে আইসিটি ব্যবহার করে মানব উন্নয়ন এবং সুরক্ষার দিকটিতে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দরিদ্র নাগরিকদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রয়োগ করে।
- (৬) ভারতঃ ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারত পাবলিক সেক্টরে অনেক পরিবর্তন এনেছে। তাদের সাম্প্রতিক সংস্কার প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করে দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপ হ্রাস করা। এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রক্রিয়া সরলীকৰণ, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি হ্রাস করা এবং ই-গভর্নর্ন্সের কার্যকর ব্যবহার। তারা বেসরকারি খাতের সুবিধার্থে Ease of Doing Business -এর সংস্কার করে একক-উইন্ডো ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ের অনুমোদন ও অনুমতিপ্রদান প্রক্রিয়া হ্রাস করে ব্যবসায়ের জন্য নিয়ন্ত্রক পরিবেশকে সহজ করে তুলেছে। সরকারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন দক্ষতা আনতে যুগ্ম সচিব পর্যায়ে এরিয়া স্পেশালিস্টদের ল্যাটোরাল এন্ট্রি (lateral entry) হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। নীতি প্রণয়ন ও প্রশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য-মাইগভ প্ল্যাটফর্ম (my gov platform) সুনাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে সুযোগ করে দিয়েছে। তথ্যের অধিকার আইন (আরটিআই) নাগরিকদের তথ্য অভিগ্রহ্যতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। তদুপরি, Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) নাগরিকদের অভিযোগের সমাধানে সহায়তা করে। অভিযোগকারীর নিবন্ধনের সময় প্রদত্ত নিবন্ধিকরণ আইডি দিয়ে সিপিজিআরএমএসে দায়ের করা অভিযোগের ছাতি ট্র্যাক করা যেতে পারে। এমনকি অভিযোগের সমাধানে সম্পূর্ণ না হলে নাগরিকদের জন্য আপিল সুবিধাও রয়েছে। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অধ্যন কর্মচারীদের কাছে আর্থিক/প্রশাসনিক ক্ষমতা কার্যকর প্রত্যর্পণ এবং তারপরে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে ফাইল নিষ্পত্তির একক পয়েন্ট নিশ্চিত করার জন্য ডেক্স অফিসার সিস্টেম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তদুপরি, সরকারি কর্মচারীদের নেতৃত্বে এবং সততার মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের ডিজিটাল রেকর্ডের জন্য E-Human Resource Management System (EHRMS) এবং এমআইএসের জন্য ড্যাশবোর্ড প্রবর্তন কর্মী পরিচালনার রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে।

(৭) পাকিস্তানঃ পাকিস্তান সরকার ২০১৫ সালে পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত ‘পাকিস্তান ভিশন-২০২৫’ প্রণয়ন করে এবং সিভিল সার্ভিস সংস্কারকে এর প্রধান লক্ষ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। নেতৃত্বের গুণাবলী এবং অর্জিত দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হয়। হস্তান্তরযোগ্য বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য মুখ্য কার্যসম্পাদন সূচকগুলোর (Key Performance Indicators) মাধ্যমে সংস্কার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে পাঞ্চাবের শিয়ালকোটের ডেপুটি কমিশনার জনসাধারণের পরিবেশ ব্যবস্থার উন্নতি এবং তাদের দোরগোড়ায় মৌলিক পরিবেশ পৌছে দিতে প্রশাসনে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা জোরদার করেন। এ ছাড়া সরকার ও জনগণের মধ্যে আঙ্গ ও উন্মুক্ততার পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও ডেটা ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের কিছু কাজ নাগরিকদের কাছে অর্পণ করার প্রয়াসে একটি ডিজিটাল প্রকল্প চালু করেন।

উল্লিখিত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নাগরিকদের চাহিদা পূরণের প্রতি অধিকতর সক্রিয় হওয়ার জন্য প্রথাগত জনপ্রশাসন থেকে সরে গিয়ে জনপ্রশাসনকে রূপান্তর করতে শুরু করেছে এবং সিভিল সার্ভিসকে আরও পেশাদার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও সক্ষম জনপ্রশাসন গড়ে তোলার কাজ করছে। জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণে বাংলাদেশ এ ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে এবং আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পথে নিয়ে যেতে পারে।

গ. বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংস্কারের নতুন উদ্যোগের যৌক্তিকতা

জনমুখী প্রশাসন বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন একটি প্রশাসন ব্যবস্থা যেখানে জনসেবা হবে মুখ্য কাজ। এখন প্রয়োজন হচ্ছেঃ (১) জনসেবা প্রদানের কাজকে সহজীকরণ, জনগণ যেন হয়রানীর সম্মুখীন না হয় এরূপ প্রক্রিয়া প্রবর্তন এবং উদ্ভৃত জটিলতা পরিহার করে এমন আইন ও বিধি-বিধানসমূহের সংস্কার করা। বিশেষ করে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কঠি বিষয়ে জনগণ সর্বাপেক্ষা ভোগাত্তির সম্মুখীন হয় সেগুলোকে সামনে রেখে সংস্কারের প্রস্তাব করা; (২) প্রতিটি দণ্ডে জবাবদিহিতার প্রচলিত বিধানকে আরও শক্তিশালী করা; (৩) জনবাস্তব জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য নেতৃত্ব এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং (৪) জনপ্রশাসনকে রাজনীতি মুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রদান করা।

যে কোনো সংস্কার কার্যক্রম অথবা পরিবর্তন অথবা আইন বিধি-বিধানের প্রণয়ন করার পূর্বে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রচলিত পদ্ধতি ও পরিবর্তন এবং ভূ-রাজনীতি প্রভাবক বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রভাবক, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করাও আবশ্যক।

সাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোতে আমলাত্ত্বের ভূমিকা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। ফলে প্রজাতন্ত্বের কর্মচারীরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমূলত রেখে নির্বাচিত সরকারের নীতি ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অভিভ্রতা বলছে যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক বা সামরিক শাসন সকল সরকারই কমবেশি বৈরতান্ত্রিক বা কর্তৃত্বাদী আচরণ করেছেন। তারা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুশীলন করে করেছেন এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার পূর্ণস্বত্ত্বাবে দেননি। আবার সব সরকারের বিরুদ্ধেই কমবেশি দূর্বীতির অভিযোগ ছিল। এক্ষেত্রে আমলারাও পিছিয়ে ছিল না। জনবিরোধী সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরও সম্পৃক্ততা ছিল। এরূপ হওয়ার বাস্তবতা ছিল যে, সরকারি কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে জিম্মি ছিল। যেমন তাদের নিয়োগ, বদলি বা পদোন্নতি সব কিছুতেই তাদের মুখাপেক্ষী থাকতে হতো। কোনো সৎ ও সাহসী কর্মকর্তা নিয়মমাফিক কাজ করতে চাইলে তাকে অপছন্দের জায়গায় বদলি করা হতো। এমন উদাহরণ পাওয়া কঠিন নয় যে, প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাদের অনৈতিক চাপ দেওয়া হতো এবং তাতে সম্মত না হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো।

যে সব কারণে জনপ্রশাসনকে নাগরিকদের স্বার্থে কাজ করতে দেয়নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে দূর্বীতির বিষ্টার। সরকারি কর্মকর্তারা কখনো কখনো এমন সব একচ্ছত্র ক্ষমতা পেয়ে যান যার মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। কর্মকর্তাদের কোন বিষয়ে কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট করে যুক্তিসংগতভাবে দেওয়া উচিত এবং সাথে থাকতে হবে জবাবদিহিতার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে পূর্ববর্তী সরকারের অবসানের পর রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন আনার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। এখন সময়ের দাবি হচ্ছে, এমন একটি জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্য, সামাজিক সুবিচার ও মানবিক মর্যাদার সর্বোচ্চ মূল্যবোধ সমূলত রাখতে দৃঢ়প্রত্যয়ী হবে।

বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্য স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেকগুলো কমিশন/কমিটি গঠিত হয়েছে এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন সংস্কার কমিশন/কমিটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রেক্ষাপটে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে। এসব কমিশনের অনেক সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রক্রিয়া কখনো থেমে থাকেনি। বিগত ৫ আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্র জনতার এক নজরিবহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ পনের বছরের শাসনের পতনের পর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনসহ প্রথমে ছয়টি ও পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করে।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য এ পর্যন্ত নিয়োজিত অন্যান্য কমিশন/কমিটি থেকে এবারের সংস্কার কমিটির প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য অনেক ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমত, এ কমিশনটি একটি বৈপ্লাবিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি দীর্ঘকালীন অগণতাত্ত্বিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের পতনের পর উত্তৃত জনআকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণে প্রতিষ্ঠিতবন্দ। বিপুরী শক্তি ও জনগণের দাবির প্রতিক্রিয়ায় সরকার কমিশনসমূহ গঠন করেছে, যার লক্ষ্য রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এরূপ সমন্বিত সংস্কার উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

একটি অত্যন্ত ব্যাপক, অসাধারণ ও জটিল প্রেক্ষাপটে এবং একটি সার্বিক রাষ্ট্র পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সর্বাত্মক লক্ষ্য অর্জনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে প্রশাসন সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব বর্তমান জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের উপর ন্যস্ত। পূর্বের যে কোনো কমিশন/কমিটির ধরনের কোনো পটভূমি ও লক্ষ্য ছিল না। আগের কমিশন/কমিটির সাথে এবারের মত গণপ্রত্যাশাও সম্পৃক্ষে ছিল না। কমিশনের কাছে সংস্কার বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রত্যাশা একরকম এবং রাজনীতিবিদের প্রত্যাশা হয়তো অন্য রকম হতে পারে। তবে, জনপ্রশাসনের অভ্যন্তরে যারা কর্মরত আছেন সেসব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবন্দ কমিশনের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব প্রত্যাশা পূরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আশা করছেন। এসব কারণে কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে বহুমুখী জটিলতা রয়েছে এবং কমিশনকে সব দিক বিবেচনায় এনে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সুচিপ্রিয় ও বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এ জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। মাত্র তিনি/চার মাস সময়ের মধ্যে এ কাজ সম্পাদন অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। বাংলাদেশের কোনো সংস্কার কমিশনকেই এত কম সময়ের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করতে হয়েছি। প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এক বছর সময় পেয়েছে Regulatory Reform Commission (অক্টোবর ২০০৭ থেকে অক্টোবর ২০০৮)। এটাই ন্যূনতম সময় এবং সর্বোচ্চ প্রায় তিনি বছরেও অধিক সময় পেয়েছে Public Administration Reform Commission (১৯৯৭ জুন থেকে ২০০০)।

জনপ্রশাসন বিগত সময়ে পূর্ববর্তী সরকারের নিজস্ব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আজ্ঞাবহ যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে জনপ্রশাসনের ভেতরও অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রশাসনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে নীতিহীনতা, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, বৈষম্য, রাজনীতিকীরণ, দুর্নীতি ইত্যাদি প্রশাসনকে স্বাভাবিকভাবে দুর্বল ও অকার্যকর করে ফেলেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে জনগণ ও সরকারের প্রত্যাশা পূরণে এ প্রশাসন সক্ষম নয়। ফলে জনপ্রশাসন সংস্কারের প্রথম কাজ হচ্ছে প্রশাসনে বিরাজমান বর্তমান ক্ষতসমূহ সারিয়ে একে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ও সেইসাথে যুগপৎভাবে প্রশাসনকে বৃহত্তর জনপ্রত্যাশা পূরণে প্রত্যয়ী, নিবেদিত ও সক্ষম করে গড়ে তোলা।

দীর্ঘ সময়ব্যাপী ঢালাওভাবে রাজনীতিকীরণের কারণে দেশের জনপ্রশাসন তার গণমুখীতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। সেইসাথে অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অকার্যকারিতা গোটা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে গণতাত্ত্বিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের প্রত্যাশা পূরণে এ প্রশাসন ব্যবস্থা কোনভাবেই উপযুক্ত নয়। এমতাবস্থায়, প্রশাসনকে কীভাবে জনমুখী, জবাবদিহি, দক্ষ ও নিরপেক্ষ করে গড়ে তোলা যায় সেব্যাপারে সুপারিশ প্রদানের জন্য বর্তমান জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিশন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জনপ্রশাসনে জনমুখীতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। এসব পরিভাষাগুলো সম্পর্কে নিম্নে একটু আলোকপাত করা হলোঃ

(১) জনমুখীতাঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সঙ্গত কারণেই শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে জনগণ অবস্থান করে। জনআকাঞ্চা পুরণের জন্য জনমুখী প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। জনমুখী প্রশাসন অতির্ভুক্তমূলক, জনকেন্দ্রিক এবং সরকারি কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। অধিকন্ত, সরকার ও প্রশাসনের বৈধতা জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। জনমুখী প্রশাসন এ বৈধতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সমাজে বৈষম্যহীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্য। এ ধরনের প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ থাকায় এর মাধ্যমে জনগণও ক্ষমতাবান হয়ে উঠে। মজবুত ও টেকসই গণতন্ত্রের জন্য জনগণের ক্ষমতাবান একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনমুখীতা নিশ্চিত করা যায়। এ জন্য প্রশাসনিক কাঠামো, আইনি বিধি বিধান, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, এবং সংশ্লিষ্ট সবার আচরণে পরিবর্তন আনয়ন করা দরকার। সরকারি নীতি ও কর্মসূচিগুলো যাতে এমনভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয় যাতে নাগরিক কেন্দ্রিক সেবাপ্রদান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন হয়। সর্বোপরি, টেকসই জনমুখী প্রশাসন গড়ার জন্য কাঠামগত ও কার্যগতভাবে জনগণের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের তত্ত্ববধানে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জনমুখী প্রশাসন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

(২) জবাবদিহিতাঃ জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ও উন্নয়ন, কার্যকর সেবা প্রদান, দুর্বীতি প্রতিরোধ, জনসম্প্রৱৃত্ত বৃদ্ধি, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমত্বে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতার ভূমিকা অপরিসীম। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে গতিশীল, কার্যকর এবং গণ-আস্থা সম্পন্ন করে গড়ে তুলে। প্রশাসনের মূল ব্যাধি দূর্বীতিকে নিয়ন্ত্রণ, দুর্বীতি বিরোধী সংস্কৃতির বিকাশ ও একে নেতৃত্বিক ভিত্তিতে উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য জবাবদিহিতার কোনো বিকল্প নেই। প্রশাসন জবাবদিহিতাবিহীন হলে কার্যত সরকার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়, দেশে মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্র উভয়ই বিপন্ন হয়।

(৩) দক্ষতাঃ দক্ষতা হচ্ছে প্রশাসনের মূল চালিকা শক্তি। কার্যকর প্রশাসন ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও সক্ষম জনপ্রশাসন অপরিহার্য। প্রশাসনে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত ও নেতৃত্বের দক্ষতা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে। তথ্য প্রযুক্তি ও ক্রত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বর্ধনশীলতার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশাসনে প্রযুক্তিগত ও নেতৃত্বিক দক্ষতার উৎকর্ষতা সাধন করা এখন সময়ের দাবি। দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং মেধা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উভাবনী শক্তিবৃদ্ধি করা দরকার। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রত্যাশা ও ঝুঁকি এবং জটিল বৈশিক গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মত নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা প্রশাসনিক দক্ষতার অন্যতম একটি বিষয়। এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনে এর কার্যকারিতা (effectiveness) ও কর্মকুশলতা (efficiency) নিশ্চিত না হলে দক্ষতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পূর্হা ও কাজ করার উৎসাহ উদ্দীপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না। অথচ দক্ষতা উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

(৪) নিরপেক্ষতাঃ প্রশাসনের উপর আস্থা জনগণ ও সরকার উভয়ের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দক্ষতার কার্যকারিতা ও নিপুণতা এবং সেবা প্রদানে নিরপেক্ষতা রক্ষার মাধ্যমে আস্থার ভিত্তি মজবুত হয়। দলীয়করণ দুর্বীতি ও পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে প্রশাসন গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জনগণের ভোগান্তি বাড়ায় এবং সরকার ও প্রশাসনের উপর জনগণের আস্থা উদ্বেগজনকভাবে হাস পায়। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে জনপ্রশাসন যাতে জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করে ও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানের উর্ধে উঠে কাজ করতে পারে সে জন্য বর্তমান সংস্কার প্রচেষ্টায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ প্রশাসনে নিয়োজিত মানব সম্পদের মধ্যে মেধা ও সততার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জনপ্রশাসন সংস্কারের উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের হার্ডওয়্যার (তথ্য এর ভৌতিক কাঠামো ও আইনগত কাঠামো) এবং সফটওয়্যার (তথ্য আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পরিমত্ব) উভয় ক্ষেত্রেই সমন্বিতভাবে পরিবর্তন সাধন করা দরকার। প্রশাসনে জনমুখীতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এদের প্রত্যেকের সাথে সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারে যুগপতভাবে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রশাসনের কাঠামো ও আইনে পরিবর্তন আনা ততটা জটিল নয়; তবে প্রশাসনিক আচরণ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অপরদিকে, জনপ্রশাসনের সাংগঠনিক ও জনবলের যৌক্তিকীকরণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করাও গুরুত্বপূর্ণ।

জনপ্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যঃ বাংলাদেশে জনপ্রশাসনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বা ভিশন হতে পারে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুশাসনের উপাদান হলোঁ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক, দক্ষ, কার্যকর ও গতিশীল শাসন ব্যবস্থা। সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন, মেধাভিত্তিক জনপ্রশাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন। তাই জনপ্রশাসনকে উচ্চাবনী, অভিযোজিত ও টেকসই উন্নয়নের ধারক-বাহক হতে হবে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যাতে তারা জনবান্ধব, নেতৃত্ব, বিনয়ী, সহশীল, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও গতিশীল হয়। এটি অর্জন করার জন্য প্রথমে জনপ্রশাসনের মূলনীতি (Core Values) এবং লক্ষ্য (Goals) সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সংস্কার কোনো সাময়িক প্রক্রিয়ার বিষয় নয়। বরং সংস্কার হতে হবে একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ যা প্রতিটি মন্ত্রণালয় ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করবে। সরাসরি জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ, পর্যালোচনা, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে একটি জনমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ তথা বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন। উন্নত ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্য থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ভারসাম্য রক্ষার একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

চ। সংস্কার কর্মসূচির আলোচ্য বিষয়ঃ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে বাংলাদেশের উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরির যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে জনপ্রশাসনকে (ক) জনমুখী, (খ) জবাবদিহিমূলক, (গ) দক্ষ এবং (ঘ) নিরপেক্ষভাবে পুনর্গঠন করার কথা বলা হয়েছে। জনপ্রশাসনের কার্যপরিধির উপর গুরুত্বারোপ করা এবং প্রস্তাবিত নতুন জনপ্রশাসনের উন্নিখিত চারটি লক্ষ্যের দিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটা স্পষ্ট যে, জনপ্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার সাথে আরো কিছু বিষয় যুক্ত হওয়া উচিত। বস্তুত জনপ্রশাসনকে জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ এবং নিরপেক্ষ হিসেবে পুনর্গঠনের পাশাপাশি তাকে কার্যকর এবং সুনিপুন করেও গড়ে তুলতে হবে। একইভাবে দক্ষ প্রশাসনের লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সঠিক কৌশলগত নেতৃত্বের বিকাশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উপরে উন্নিখিত চারটি লক্ষ্যকে সম্প্রসারিত করে জনপ্রশাসনকে আরো কার্যকর ও পরিমেবায় কর্মকুশল করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সার্বিকভাবে জনপ্রশাসন সংস্কারের জন্য কমিশন নিয়ন্ত্রিত ছয়টি লক্ষ্যকে বিবেচনা করেছে:

ক) গণমুখী জনপ্রশাসন, (খ) স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, (গ) জনপ্রশাসনের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন, (ঘ) নিরপেক্ষ জনপ্রশাসন, (ঙ) জনপরিবেশ সুনিপুনতা, এবং (চ) কার্যকর জনপ্রশাসন।

উপরে উন্নিখিত আলোচনায় জনমুখী সংস্কারে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা, ডিজিটাল রূপান্তর এবং প্রবেশগ্রান্তি বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে যাতে জনপ্রশাসন নাগরিকদের চাহিদা পূরণ করে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য দুর্বীতির বিরুদ্ধে লড়াই, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহি করার প্রক্রিয়া জোরদার করা প্রয়োজন। দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, প্রতিভা আকৃষ্ট করা এবং জনসেবাকে পেশাদারিকরণের উপর জোর দিতে হবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমাতে আইনের শাসন ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিমেবা সরবরাহ, ডিজিটাল রূপান্তর এবং সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া সহজীকরণ করতে হবে। পরিশেষে, প্রযুক্তি গ্রহণ, আন্তর্সংস্থা সমন্বয় উন্নত করা এবং বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রশাসনের কার্যকারিতা বাড়ানো সম্ভব।

অধ্যায় তিন

জনপ্রশাসনের রূপকল্প, মূল নীতি, লক্ষ্য ও নেতৃত্ব

ক। জনপ্রশাসন সংক্ষারের রূপকল্প (**Vision**): বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংক্ষারের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বা রূপকল্প হবে একটি জনমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক, নিরপেক্ষ ও কর্মদক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা, যা দেশের জনগণকে নিবেদিত ও সততার সাথে সেবা প্রদানপূর্বক একটি সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতি গঠনে অবদান রাখবে। এক কথায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

খ। মূল মূল্যবোধঃ (**Core Values**): জনপ্রশাসনের যে সকল মূল্যবোধ অধাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে তাকে নিম্নলিখিত শিরোনামে চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

- ১) নাগরিক কেন্দ্রিকতাঃ জনসেবা প্রদানের সর্বক্ষেত্রে নাগরিকদের চাহিদা ও স্বার্থকে অধাধিকার দিতে হবে।
- ২) সততা ও নীতিবোধঃ সকল কাজে নৈতিকতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে।
- ৩) পেশাদারিত্ব ও যোগ্যতাঃ মানসম্পন্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ৪) ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তিঃ অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সাথে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।
- ৫) সংবেদনশীলতা ও অভিযোজনযোগ্যতাঃ সরকারি কর্মচারীদের সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে এবং নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সুযোগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।
- ৬) আইনের শাসনঃ আইনের শাসন সমূলত রাখা এবং সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে সকল কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করা।

গ। লক্ষ্য (**Goals**): সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সকল নাগরিকের অভিগ্রহ্যতা এবং সেবার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করতে হবেঃ

- ১) সুশাসনকে শক্তিশালী করাঃ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- ২) দক্ষতা বৃদ্ধি করাঃ জাতির বার্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারি কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করা।
- ৩) নীতি কার্যকারিতাঃ দেশের উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় সক্ষম এবং টেকসই উন্নয়নে সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ৪) উত্তীর্ণ ও প্রযুক্তিঃ সরকারি পরিষেবা সরবরাহের উন্নতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও উত্তীর্ণ।
- ৫) সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বঃ অংশীজনদের সাথে অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।
- ৬) দুর্বীতি হ্রাসঃ সরকারের সকল স্তরে দুর্বীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ৭) বিকেন্দ্রীকরণঃ জনগণের পরিষেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়ন করা।
- ৮) টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণঃ সকল প্রকার জননীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়কে বিবেচনায় রাখা।
- ৯) লিঙ্গ সমতা বিধানঃ সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে নারীদের সমান সুযোগসহ জননীতিতে তাদের চাহিদার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ। জনপ্রশাসন সংস্কারের নেতৃত্ব কাঠামোঃ দেশের জনপ্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্য বিগত ৫৩ বছরে দুই ডজনের বেশি কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সেগুলো প্রধানত দুইটি কারণে প্রৱোপুরি বাস্তবায়ন ও টেকসই হয়নি। প্রথমত রাজনৈতিক নেতৃত্ব সব সুপারিশ গ্রহণ করেনি এবং যে সব সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন তার বাস্তবায়নে তারা আতরিক বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না। দ্বিতীয়ত স্বার্থগত দ্বন্দের জন্য সংশ্লিষ্ট আমলারা তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেনি। জনপ্রশাসন সংস্কার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের যদি সদিচ্ছা থাকে এবং সার্বিক পরিস্থিতি যদি অনুকূল থাকে তাহলে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। সেক্ষেত্রে সরকার প্রধানের সরাসরি নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজে হাত দেওয়া উচিত। অপরদিকে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সিভিল সার্ভিসকে সরকার প্রধানের নির্দেশনায় বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক নেতৃত্ব দিতে হবে। যেহেতু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি সরকার প্রধানের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, সেহেতু সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নেতৃত্ব ওই বিভাগকেই প্রদান করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

ঙ। ছায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনঃ যেহেতু জনপ্রশাসন সংস্কারের কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর কিছু বিষয় স্বল্প মেয়াদি, কিছু বিষয় মধ্য মেয়াদি এবং কিছু বিষয় দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে হয়। বিভিন্ন সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে কোনো কোনো সংস্কার কার্যক্রমে শুরুগতি বা পরিবর্তন আসতে পারে। এ ছাড়া জনপ্রশাসনে নতুন নতুন উভাবন প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকা উচিত, নতুন বা জনপ্রশাসন তার গতি হারাতে পারে। এ বিবেচনায় একটি ছায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করার বিষয়টি বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি বলে কমিশন মনে করে।

চ। ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনঃ সরকার কার্যক্রম সম্পাদন ও নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে একদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়; অপরদিকে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। যদিও দেশে অনেকদিন ধরে সকল সরকারি অফিসে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা চলছে, তবুও কাজিখত সুফল পাওয়া যায়নি। সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও নাগরিকদের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করার জন্য ওয়েবপোর্টাল-ভিত্তিক একটি সময়সিদ্ধি ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরি করা হলে নাগরিক সেবা প্রদান আরো স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে করা সম্ভব হবে বলে কমিশন মনে করে। এরপে ওয়েবপোর্টালে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে কোনো নাগরিক তার ন্যাশনাল আইডি দিয়ে লগ-ইন করে অতি সহজেই তার চাহিদামত তথ্য ও প্রতিকার পাবে। ওয়েবপোর্টালভিত্তিক একটি সময়সিদ্ধি ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরি করার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মূল মডিউল ও সার্ভার রেখে এ কাজটি সম্পাদন করতে হবে।

ছ। সুপারিশমালাঃ জনপ্রশাসনের রূপকল্প (Vision), মূলনীতি (Core Values) ও লক্ষ্য

৩.১	জনপ্রশাসনের রূপকল্প (Vision): ‘প্রজাতন্ত্রের সর্বস্তরে নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠা করা’।	
৩.২	জনপ্রশাসনের মূলনীতি (Core Values): জনবান্দব, নেতৃত্ব, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক, নেতৃত্বিক, দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন।	
৩.৩	লক্ষ্য (Goals): ‘প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে নির্ধারিত সেবা প্রদান করা’।	
৩.৪	সুপারিশ বাস্তবায়নের মেয়াদঃ স্বল্প মেয়াদি (৬ মাস), মধ্যমেয়াদি (১-২ বছর) ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ।	
৩.৫	ছায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনঃ জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় টেকসই সংস্কার বাস্তবায়নের স্বার্থে একটি স্বাধীন ও ছায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	স্বল্পমেয়াদি
৩.৬	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনঃ সংবিধান ও বাংলাদেশ যে সকল আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুসরণ করে তার আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জনপ্রশাসন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে।	স্বল্পমেয়াদি
৩.৭	জেনেরিক রোডম্যাপ প্রণয়নঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জনপ্রশাসন সংস্কার কর্মসূচির একটি জেনেরিক রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সে আলোকে নিজ নিজ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে ছায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনে প্রেরণ করবে। কমিশন তা পরীক্ষা করে চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের অধীনস্থ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোকে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	মধ্যমেয়াদি
৩.৮	উভাবনী ল্যাব প্রতিষ্ঠাঃ জনপ্রশাসনে নতুন নতুন উভাবনী প্রক্রিয়া ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা ও গবেষণা করার লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে (যেমন- বিপিএটিসি বা বিআইজিএম অথবা সমমানের প্রতিষ্ঠান) ল্যাব হিসেবে নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি
৩.৯	ওয়েবপোর্টালভিত্তিক ডিজিটাল প্লাটফর্মঃ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর জনপুরুষ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিধিবিদ্ধ ও প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলোকে সময়সিদ্ধি ওয়েবপোর্টালভিত্তিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে। উভ ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে প্রধান প্রধান কার্যসম্পাদন বিষয় (Key Performance Areas-KPA), পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকবে।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় চার

জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের আচরণগত ও দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষার

ক। সিভিল সার্ভিস কোড়ঃ স্বাধীনতার পর থেকে গণতন্ত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নির্ধারণ, সংজ্ঞায়িত বা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সীমিত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত সরকারের নীতিগত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে আমলাতন্ত্র কী ভূমিকা পালন করবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। এ ব্যর্থতা দুঃভাবে প্রভাব ফেলেছে: কখনও আমলাতন্ত্র এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, এটি রাজনৈতিক নেতো ও নাগরিকদের উপেক্ষা করেছে; আবার কখনও এটি দলীয় রাজনীতির প্রভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদিও বিভিন্ন আইন, বিধি এবং নীতিমালা সময়ে সময়ে প্রণীত হয়েছে; কিন্তু সেগুলো সেবার পেশাগত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট কার্যকর ছিল না, যা নির্বাচিত সরকার এবং নাগরিক উভয়ের সেবা করার পাশাপাশি সত্য কথাগুলো বলার সাহস প্রদান করতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে আমলাতন্ত্রের জন্য কিছু মৌলিক পেশাগত মূল্যবোধ চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যা সংক্ষার প্রস্তাব তৈরি ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। আমলাতন্ত্রকে দলীয় প্রভাব ও অনেকটি প্রলোভন থেকে সুরক্ষিত করতে পেশাগত ক্ষমতায়ন করা জরুরি এবং নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের যথাযথ সেবা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে একটি সিভিল সার্ভিস কোড ডিজাইন করা যেতে পারে, যেখানে এ মৌলিক মূল্যবোধগুলো অঙ্গুষ্ঠ থাকবে। এটি কর্মচারীদের মধ্যে পেশাগত আচরণবিধি গড়ে তুলবে, যা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আচরণবিধির তিনি হিসেবে কাজ করবে।

খ। জনপ্রশাসনের মৌলিক মূল্যবোধঃ বাংলাদেশে জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় মৌলিক মূল্যবোধ নির্ধারিত থাকা দরকার। যদিও এ সংক্ষেপ কিছু বিধিবিধান রয়েছে, তবে তা নেতৃত্বাবে অঙ্গীকারবদ্ধ কর্মচারী গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে না। যে সকল মূল্যবোধ একজন কর্মচারীকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে তার কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমনঃ

- ১) নেতৃত্ব নির্দেশনা ও সততাঃ এটি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কর্মকাণ্ডের জন্য একটি নেতৃত্ব দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এটি একজন কর্মচারীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সহায়তা করে।
- ২) জনগণের আস্থাঃ এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায্যতার প্রতি সরকারের অঙ্গীকার প্রদর্শন করে। একজন কর্মচারী তার শিষ্টাচার, সততা ও নির্ণায় দ্বারা নাগরিকদের আস্থা অর্জন করতে পারেন।
- ৩) কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিঃ একটি অভিন্ন মূল্যবোধ কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে, কর্মচারীদের মনোবল বাড়ায় এবং সংস্থার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- ৪) কার্যকর প্রশাসনঃ এটি জননীতি ও কর্মসূচি দক্ষতার সঙ্গে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সহায়ক।
- ৫) জবাবদিহিতাঃ এটি সরকারি কর্মচারীদের তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করার একটি কাঠামো প্রদান করে।
- ৬) স্বচ্ছতাঃ এটি সরকারি কর্মচারীদের পেশাগত আচরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার প্রতি প্রতিশ্রূতিবদ্ধ করে।
- ৭) প্রমাণভিত্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য, গবেষণা ও বিশ্লেষণের উপর গুরুত্বারোপ।

ঙ। সুপারিশমালাঃ জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের আচরণগত ও দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষার

৮.১	নতুন আচরণ বিধি প্রকল্পঃ সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি' (The Government Employees Conduct Rules) -এর সংশোধন করে একটি সাধারণ শিষ্টাচার ও আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রকল্প করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	স্বল্পমেয়াদি
৮.২	হলফনামায় স্বাক্ষরঃ সরকারি কর্মচারীদের প্রথম নিয়োগের পর কাজে যোগদানের সময় একটি শ্রেণীবিন্দু বা হলফ নামায় স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম, সততা, কর্তব্যনির্ণয় ও জবাবদিহিতার অঙ্গীকার থাকবে।	স্বল্পমেয়াদি
৮.৩	প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিষ্টাচারঃ সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিষ্টাচার ও আচরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অঙ্গুষ্ঠ করা যেতে পারে। দশম অধ্যায়ে একই ধরনের সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৪	পরামর্শগ্রহণের সংস্কৃতিঃ সরকারি কর্মচারীদের পরামর্শগ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৫	দক্ষতা মূল্যায়নঃ সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে মূল্যবোধ, শিষ্টাচার ও আচরণ অঙ্গুষ্ঠ করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৬	জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাঃ সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে দেয়া যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৭	জনসচেতনতামূলক প্রচারঃ সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় পাঁচ

নাগরিক পরিষেবা (Public Service Delivery) উন্নয়নে জনপ্রশাসন

ক। **সার্ভিস বা সরকারি সেবা প্রদান (Delivery of Public Services)**: সরকারি সেবা, জনসেবা বা পরিষেবা হলো সেইসব সেবা যা সে দেশের সরকার নাগরিকদেরকে বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে প্রদান করে থাকে। সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার নাগরিকদের বিভিন্ন জনসেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। এটি সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে একটি দৃশ্যমান সংযোগ তৈরি করে এবং তা নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় মূল্যবোধ প্রসারিত করে। মানসম্মত জনসেবা দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দুর্বাতি নির্মূল করতে সহায়তা করে।

অনেকে সরকারি সেবা বা জনসেবাকে দুই ভাগে ভাগ করেন। এক, সেইসব সরকারি সেবা বা জনসেবা যা সরকার দেশের নাগরিকদেরকে বিনামূল্যে প্রদান করে থাকে, যেমন নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অগ্নি-নির্বাপনসেবা, নাগরিকদের চলাচলের জন্য সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি। দুই, সেইসব সরকারি সেবা যার জন্য দেশের নাগরিকদেরকে কিছু মূল্য দিতে হয়, যেমন- বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য অপসারণ ইত্যাদি। সাধারণত এই ধরনের সেবাগুলোকে পরিষেবা বলা হয়। বাংলাদেশে সরকারি সেবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের সরকার বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর, ইউটিলিটি সরবরাহকারী স্বায়ত্ত্বাস্থিত প্রতিষ্ঠান, মেট্রোপলিটন শহর পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন, মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন জেলা ও উপজেলা পরিষদ, মধ্যম ও ছোট শহর পর্যায়ে পৌরসভা এবং গ্রাম্যস্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ।

খ। বাংলাদেশে জনসেবার বিভিন্ন খাতঃ বাংলাদেশে জনসেবা বিভিন্ন খাতে বিস্তৃত, যেমন- পুলিশ সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, বর্জ্য অপসারণ, অগ্নি নির্বাপনসেবা, বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ এবং অন্যান্য ইউটিলিটি সেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং আইনগত সেবা। আমাদের দেশে যদিও সময়ের সাথে সাথে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তবে এই সেবাগুলোর দক্ষতা, অভিগ্রহ্যতা এবং মান প্রায়শই জনসাধারণের প্রত্যাশার অনেক নীচে রয়েছে। নাগরিকদের সম্মতির জন্য জনসেবা প্রদান আধুনিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে এমনকি কর্তৃত্বাদী শাসকরাও জনসেবাকে উপেক্ষা করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর জন্য জনসেবা উপেক্ষা আরো ঝুঁকিপূর্ণ। স্বাভাবিক নিয়মেই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে জনসেবার জন্য নাগরিকদের দাবি ও চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে হয়। যদিও বিভিন্ন ধরনের সেবা সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তায়, তবুও স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য সংস্থা সেবা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত।

গ। বাংলাদেশে জনসেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জঃ বাংলাদেশে জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(১) **জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাবঃ** আমলাতত্ত্বের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেই বা যেসব জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর দুর্বলতার কারণে সঠিকভাবে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। জবাবদিহিতার প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বিশেষ করে পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি এবং সরকারি অডিটরে প্রতিষ্ঠান অডিটর জেনারেল কর্তৃক সম্পাদিত অডিট এবং সরকারি হিসাব পদ্ধতির দুর্বলতার কারনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং সরকারি দণ্ডের জবাবদিহি ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না।

(২) **সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতা:** সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অদক্ষতা সর্বজনবিদিত। এই অদক্ষতা মূলত দুটি কারনেঃ

(ক) **কেন্দ্রীভূত (Centralized) শাসন ব্যবস্থাঃ** প্রথম কারণ কেন্দ্রীভূত (Centralized) শাসন ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্বল করে রাখা। এই কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা সেবা প্রদানের পুরো ব্যবস্থাকে জাতীয় সরকার এবং আমলাতত্ত্বের উপর অতি নির্ভরশীল করে তোলে, যা সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে অদক্ষ করে ফেলে।

(খ) **প্রচলিত প্রশাসনিক পদ্ধতিঃ** প্রচলিত প্রশাসনিক পদ্ধতি ধীর লয়ে কাজ করে, এবং ব্যবহৃত ও অপরিবর্তনীয় বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারনে সেবা প্রাদানে অকার্যকর।

(৩) সেবা খাতে দুর্নীতিঃ বাংলাদেশের সকল সেবা খাতে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসারের কারণে জনসেবা প্রদানে ব্যাপক অনিয়ম হয় এবং নাগরিকদের জনসেবা পেতে হয়েরানির সম্মুখীন হতে হয়।

(৪) প্রযুক্তির অভাব বা ব্যবহারে অনীহাঃ

(ক) অবকাঠামোর অভাবঃ বাংলাদেশে উত্তোলন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাইজড সেবা ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর অভাব রয়েছে।

(খ) দুর্বল ইন্টারনেট সেবাঃ দক্ষিণ এশিয়ার বেশীরভাগ দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা অনেক দুর্বল, ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং এর ব্যবহার অনেক সীমিত। সে কারণে সরকারি সেবা প্রদানের মানও নীচু।

(গ) আইটি সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশীঃ দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে আইটি সিস্টেম ও ডাটা সেন্টার স্থাপন এবং সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি, যা সরকারি সেবাদান ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

ঘ। সুপারিশমালাঃ নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নে জনপ্রশাসন

৫.১	ডিজিটাল রূপান্তর এবং ই-সেবাঃ জনসেবা ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়াতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। একটি মূল কৌশল হতে পারে সরকারি সেবার ডিজিটাল রূপান্তর। সরকার একাধিক ই-গভর্নেন্ট সেবা শক্তিশালী করতে পারে, যেমন- অনলাইন ট্যাক্স দাখিল, ডিজিটাল জমির রেকর্ড এবং ইলেকট্রনিক জন্য নিবন্ধন, এনআইডি, পাসপোর্ট ইত্যাদি। ই-সেবা সরকারি বা জনসেবার সময় ও খরচ হ্রাস করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া এটি দূরবর্তী বা অনন্তর এলাকায় নাগরিকদের জন্য সেবার অভিগম্যতা (Access) বাড়াতে পারে। ই-সেবা স্বচ্ছতা বাড়াতে পারে এবং নাগরিকদের সাথে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে পারে। একইসাথে এটি খরচ সশ্রায়ী এবং তথ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নতি করতে পারে। ই-সেবার উন্নতির লক্ষ্যে ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম (NESS) এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে (Mobile Applications) শক্তিশালী করে আমলাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সহজতর করতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি
৫.২	তথ্য অধিকার আইনঃ নাগরিকরা যাতে সহজে ও অবাধে চাহিদামত সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন (Right to Information Act, 2009) এবং Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা ও সংশোধন করা যেতে পারে। Right to Information Act, 2009- এর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া সংযুক্ত-৪-এ রাখা হয়েছে। নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ করার জন্য পরবর্তী অধ্যায়েও সুপারিশ করা হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি
৫.৩	‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ ও এফবিসিসিআইঃ দীর্ঘদিন থেকে ট্রেড লাইসেন্স, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানির লাইন, পরিবেশ ছাড়পত্র ইত্যাদি পরিষেবার জন্য ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিসের’ কথা বলা হলো এখন পর্যন্ত তা কার্যকর নয়। এমতাবস্থায় আউট-সোর্সিং করে এফবিসিসিআই-র অধিভুক্ত জেলা চেম্বারগুলোকে ‘ওয়ান-স্টপ সার্ভিস’ প্রাপ্ত্যায় আবেদনগুলো প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। এরপর বিদ্যমান নীতিমালা ও আইনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুততার সাথে লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।	স্বল্পমেয়াদি
৫.৪	নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রাপ্ত্যায় মৌলিক অধিকারঃ দেশের নাগরিকদের সহজে পাসপোর্ট দেওয়া একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। কোনো নাগরিকের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকলে তাকে বিমান বন্দরেই যাচাই করা যেতে পারে। তাছাড়া পুলিশের হাতে ফৌজদারি মামলার আসামিদের তালিকা অনলাইনে সহজলভ্য থাকতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি
৫.৫	গণশুনানিঃ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য সরবরাহ ও তাদের সমস্যা অভিযোগগুলো শোনা (Public Hearing) বাধ্যতামূলক করে সকল সরকারি দণ্ডরকে নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি
৫.৬	‘নাগরিক কমিটি’ গঠনঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য যেমন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি রয়েছে, তেমনিভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের নিয়ে একটি করে ‘জেলা নাগরিক কমিটি’ ও উপজেলা নাগরিক কমিটি’ গঠন করার সুপারিশ করা হলো। উক্ত কমিটিতে ছাত্র প্রতিনিধি রাখতে হবে। ‘নাগরিক কমিটি’ সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে চার মাস অন্তর নিজেদের মধ্যে সভা করবে এবং তার কার্যবিবরণী জেলা কমিশনারের ওয়েবসাইটে ও সংশ্লিষ্ট দণ্ডের প্রধানের কাছে প্রেরণ করবে।	স্বল্পমেয়াদি

৫.৭	স্থানীয় এনজিও ও সামাজিক সংস্থার সম্পৃক্ততাঃ স্থানীয় এনজিও এবং সামাজিক সংস্থাগুলোকে জনপরিষেবার কাজে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৫.৮	সেব প্রদানের ক্ষমতা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরঃ সরকারি সেবা প্রদানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক অনুমোদনের শর্ত না রেখে বিভিন্ন স্তরে সরকারের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ, যেমন বিভাগ (Department)/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভাগীয় দপ্তর/ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর আর্থিক (Financial), প্রশাসনিক (Administrative) এবং কাজ (Functional) সম্পর্কিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব (Authority and Responsibility) অর্পণ (Delegation) করা যেতে পারে, যাতে করে স্থানীয় পর্যায়েই সব ধরনের সেবা প্রদান করা যায় এবং এজন্য মন্ত্রণালয় বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন না হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়গুলো প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে যেমন-(ক) বিভাগীয় প্রধান (Head of the Department), (খ) বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা, (গ) জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, এবং (ঘ) উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ক্ষমতা অর্পণের (Delegation of Power) একটিমাত্র ঋণাত্মক বা না-সূচক তালিকা প্রণয়ণ করবে, যার জন্য প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তাদেরকে তাদের এক স্তর উপরের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন চাইতে হবে। তবে এই তালিকার বাইরে অন্য সব ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেছে বলে ধরে নিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৫.৯	সেবা প্রদানকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে হট-লাইন ফোন নম্বর স্থাপনঃ সেবা প্রদানকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা প্রত্যাশী বা ভুক্তভোগী নাগরিকদের নিকট হতে সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি বা বিলম্বের অভিযোগ শোনার জন্য হট-লাইন স্থাপন করতে পারে। এই হট লাইন ২৪/৭ বা সরকারি দাঙ্গারিক দিনে খোলা রাখা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রাপ্ত অভিযোগের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত অভিযোগের উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগকারীকে অবহিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৫.১০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ (Monitoring and Evaluation): কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকার কারণে জনসেবার অদক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয় না। সতরাঁ বিভিন্ন জনসেবা প্রদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৫.১১	ইন্টারনেটের সহজলভ্যতাঃ নাগরিকদের মধ্যে ডিজিটাল বিভাজন ই-গভর্নেন্স উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস করে এবং জনসেবা প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাঁ সকল শ্রেণির নাগরিকগণ যাতে সহজলভ্য ইন্টারনেট সেবা পেতে পারে রাষ্ট্রেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৫.১২	দুর্নীতি বন্ধনঃ জনসেবা ব্যবস্থার মধ্যে ঘূষ, পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজনপ্রাপ্তির কারণে সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া বাধাদ্রষ্ট হয়। সুতরাঁ জনসেবায় দুর্নীতি বন্ধে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৫.১৩	জনসেবার বিরাজনীতিকীকরণঃ দক্ষ ও নিরপেক্ষ জনসেবা প্রদান নিশ্চিতের জন্য এসব কার্যক্রমে রাজনৈতিক পক্ষপাত এবং দলগত বিবেচনা পরিহার করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় ছয়
জনপ্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পুণ্যগঠন
(মন্ত্রণালয় ও দণ্ডনৈর সংখ্যা পুনর্বিন্যাসকরণ)

ক। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা পুনর্বিন্যাসকরণঃ বাংলাদেশের বিদ্যমান জনপ্রশাসনের কাঠামোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথাঃ (১) মন্ত্রণালয় ও বিভাগ (২) মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর (৩) বিভিন্ন সরকারি সেক্টর কর্পোরেশন (৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন। বিগত ৫৩ বছরে সরকারের মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ১৫ থেকে ৩৬-এর মধ্যে ঘোষনা করেছে। কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় অযৌক্তিকভাবে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বাঢ়ানো হয়েছে। একই বিষয়ে একাধিক মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। যেমন- নারীদের কল্যাণে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের যেমন প্রকল্প আছে, তেমনি মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়েরও কর্মসূচি আছে। ক্ষুদ্র ঝুঁতি কর্মসূচি একাধিক মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। এর ফলে একদিকে সরকারের ব্যয় বেড়েছে এবং অপরদিকে, জনপ্রশাসনের কাজের মাত্রা ও দক্ষতাও কমেছে। অতীতের সংক্ষার কমিশনগুলো ও মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ত্রাস করার সুপারিশ করেছে। কিন্তু তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি।

খ। মন্ত্রণালয়গুলোকে কয়েকটি গুচ্ছে সংগঠিতকরণঃ শুরু থেকেই জনপ্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা যে কোনো মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং পেয়ে থাকেন। এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিষয়বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কম সময়ই বিচেনায় নেয়া হয়। আবার কোনো কর্মকর্তা হয়তো বিদেশ থেকে বিশেষ কোনো বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষন নিয়ে দেশে ফিরেছেন, সে বিষয়ে বিবেচনায় না নিয়ে যেকোনো মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কোনো কর্মকর্তা একই ধরনের মন্ত্রণালয়ে কাজ করে হয়তো বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, এরপর কোনো বিবেচনা ছাড়াই রাজনৈতিক কারণ বা কারো বিরাগের কারণে তাকে অন্যত্র বদলি করে দেয়া হয়। এর ফলে মেধাবী ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। যদি একই বা কাছাকাছি কাজের ধরন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়গুলোকে কয়েকটি গুচ্ছ ভাগ করা হয় এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সার্ভিস ও বিষয়ের কর্মকর্তাদের পোস্টিং দেওয়া হয় তাহলে তাদের পক্ষে ক্যারিয়ার প্লানিং করে বিশেষজ্ঞ হওয়া সহজতর হবে। কোনো কর্মকর্তা সচিবালয়ে পোস্টিং পাওয়ার আগে যে ক্লাস্টারে অপশন দিবেন তাকে পরবর্তী চাকরি জীবনে সে ক্লাস্টারেই থাকতে হবে। পাবলিক সেক্টরে বিশেষীকরণ নিশ্চিত করার জন্য, তাদের প্রাথমিক কাজ এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রেগুলোর উপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়গুলোর গুচ্ছ হওয়া উচিত। এটি সিভিল সার্ভিসের মধ্যে একটি বিশেষায়িত ক্যারিয়ার ট্র্যাক তৈরিতে সাহায্য করবে, তেমনি যেমন প্রশাসন, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বাঢ়াতে সাহায্য করবে। মন্ত্রণালয়গুলোকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত গুচ্ছ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৯ঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রান্তাবিত গুচ্ছ

১.	বিধিবদ্ধ প্রশাসনঃ	যেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইন প্রযোগকারী, জনপ্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করে সেগুলো এ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হবে।
২.	অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্যঃ	আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয় কোকাস করে এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে এ গ্রুপে রাখা হয়েছে। এ ক্লাস্টারের লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনীতি পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখা।
৩.	মানব সম্পদ ও সামাজিক উন্নয়নঃ	এ ক্লাস্টারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর দায়িত্ব পালনরত মন্ত্রণালয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্লাস্টারের লক্ষ্য নাগরিক জীবনযাত্রার মান সামাজিক মঙ্গলজনক কার্যক্রম উন্নত করা।
৪.	ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগঃ	সড়ক, সেতু, রেলপথ এবং আবাসনের মতো ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত মন্ত্রণালয়গুলো এ ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্লাস্টারের লক্ষ্য সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৫.	কৃষি, আঞ্চলিক উন্নয়ন ও পরিবেশঃ	এ ক্লাস্টারটি টেকসই কৃষি ও আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার উপর কাজ করবে। এ ক্লাস্টারের লক্ষ্য পরিবেশগত স্থায়িত্বের সাথে মিল রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখা।

গ। প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনঃ সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও সরকারি ব্যবস্থাপনায় যে সব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার মধ্যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির চাহিদাপূরণে পরিমেবা প্রদান করাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। রাজধানী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ও পরিমেবার ব্যাপ্তির কথা বিবেচনায় রেখে এখানে মেট্রোপলিটান গভর্নমেন্ট গঠনের আলোচনাও রয়েছে। এমতাবস্থায় দেশকে পুরাতন চারটি প্রদেশ এবং রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্রশাসিত এলাকা হিসেবে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ঘ। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও ১০ টি প্রশাসনিক বিভাগ গঠনঃ বিভিন্ন সময়ে জনদাবির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে মোট ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগ গঠনের দাবি অনেক দিনের। ভৌগোলিক ও যাতায়াতের সুবিধা বিবেচনায় কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করা যেতে পারে। ভৌগোলিক সীমারেখা ও জনসংখ্যা বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান ৮টিসহ মোট ১০ টি বিভাগের পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সে ব্যবস্থাকে অস্বাস করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো উপজেলা পর্যন্ত শক্ত কাঠামোর উপর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাঁড় করানো প্রয়োজন। সাধারণ নাগরিকগণ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় যাতে সহজে ন্যায়বিচার পেতে পারে সেজন্য উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করাও প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

ঙ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসঃ জনপ্রশাসনের আওতায় প্রজাতন্ত্রের যে সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর রয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো বিশেষ কার্যকর নয়। সময়ের পরিক্রমায় কোনো কোনটি প্রাসঙ্গিকতাও হারিয়ে ফেলেছে। কোনো কোনো সংস্থায় জনবলও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি রয়েছে। আবার এমন কিছু সংস্থা আছে যেগুলোর কার্যক্রম আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু সে অনুপাতে জনবল বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৮২ সালে সামরিক সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো যৌক্তিকীকরণের জন্য ‘এনাম কমিটি’ গঠন করেছিল। উক্ত কমিটির সুপারিশ মেতাবেক জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়নের পরে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনকার চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো কর্তৃক স্ব স্ব জনবল কাঠামোর পরীক্ষানিরীক্ষা করে যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

চ। বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনের পুনর্বিন্যাসঃ সরকারি খাতে বেশ কিছু স্বায়ত্ত্বশাসিত বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশন রয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান এক সময় জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশোনা করত। সময়ের ব্যবধানে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তা ব্যক্তিক্ষেত্রে বিক্রি করা হয়ে গেছে। তারপরও লোকসানের বোৰা নিয়ে বেশ কিছু করপোরেশন এখনও সরকারের জন্য বোৰা হয়ে টিকে আছে। প্রচুর ভর্তুকি দিয়ে এদেরকে চালানো হচ্ছে। এ সকল বাণিজ্যিক কর্পোরেশনে প্রচুর অপ্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে যা ছাটাই করা দরকার। রাজনেতিক কারণে কিছু প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার কথাও বলা হয়ে থাকে। সরকারের উচিত হবে বাণিজ্যিক করপোরেশনগুলোর বর্তমান কর্মসূচি, জনবল ও অর্গানিঝেমেন্ট পর্যালোচনা করে তাকে যৌক্তিক ও বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা। অপরদিকে, রাষ্ট্রায়ান্ত করপোরেশনগুলো যদিও স্বায়ত্ত্বশাসিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো স্বাক্ষর হওয়ার পরিবর্তে অনেকটা সরকারি ডিপার্টমেন্টের মত কাজ করছে। সুতরাং রাষ্ট্রায়ান্ত বাণিজ্যিক করপোরেশন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

ছ। মন্ত্রণালয়ের নীতি ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ শক্তিশালীকরণঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা কোষ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও একই কাজের জন্য প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে করে একদিকে সময়ের অপচয় হয় এবং অপরদিকে, একই কাজ দু'বার করা হয়। সুতরাং মন্ত্রণালয়ে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি যাতে আরো কার্যকরভাবে সম্পাদন করা যায় সেজন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে নীতি ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ গঠন করে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ জনবল নিয়োগ করতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন শুধু সামষ্টিক অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করবে।

জ। রাজ্য বোর্ডের নীতি ও বাস্তবায়ন পৃথকীকরণঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও রাজ্য বোর্ডের চেয়ারম্যান একই কর্মকর্তা রাজ্য নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের রাজ্য নীতি প্রণয়ন করার কথা। কিন্তু জাতীয় রাজ্য বোর্ড রাজ্য নীতি ও বাস্তবায়ন উভয় কাজই করার ফলে তাদের কাজের জবাবদিহিতা যথার্থভাবে হয় না। সুতরাং একদিকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের রাজ্য নীতি প্রণয়ন করবে। অপরদিকে, রাজ্য নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য তিনটি আলাদা অধিদপ্তর গড়ে তুলতে হবে। যথা (ক) আয়কর অধিদপ্তর (খ) শুল্ক ও আবগারি অধিদপ্তর (গ) মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অধিদপ্তর।

ৰা। ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস একই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আনয়নঃ বর্তমানে জমি ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রি করার ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন সঠিকভাবে হয় না। সাম্প্রতিককালে ভূমি অফিসে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হলেও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এখন পর্যন্ত ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আসেনি। অতি দ্রুত তা করা উচিত। সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বর্তমানে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে। এ দণ্ডটি দ্রুত ভূমি অফিসের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা উচিত।

এও। বিবাহ রেজিস্ট্রিরণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণঃ বিবাহ রেজিস্ট্রি মুসলিম সমাজের একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। বর্তমানে নিকাহ রেজিস্ট্রিরণ আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক লাইসেন্স পেয়ে থাকেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসকের অধীনে ন্যস্ত করা হলে কাজটি অনেক সহজ হবে।

ট। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংস্কারঃ বর্তমানে দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন রয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই অধিকতর কার্যকর করার জন্য সংস্কার করা প্রয়োজন। সবচেয়ে প্রাচীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা। এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা গেলে নাগরিকরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। উপজেলা পরিষদ যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চালু করা হয়েছিল তা পুরাপুরি কার্যকর করা হয়নি। একে কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। জেলা পরিষদকে কখনোই জনপ্রতিনিধিত্বশীল করা যায়নি। অধিকাংশ জেলা পরিষদগুলো তহবিলের দিক থেকেও দুর্বল অবস্থায় আছে। উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হলে জেলা পরিষদের প্রাসঙ্গিকতা কমে যাবে। সুতরাং জেলা পরিষদকে বাতিল করা সমীচীন হবে।

ঠ। সুপারিশমালঃ জনপ্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পুনর্গঠন

৬.১	মন্ত্রণালয়গুলোর সংখ্যা হ্রাস করাঃ বর্তমানে মোট ৪৩ টি মন্ত্রণালয় এবং ৬১ টি বিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়গুলোকে যুক্তিসংগতভাবে হ্রাস করে কমিশন সরকারের সকল মন্ত্রণালয়গুলোকে মোট ২৫ টি মন্ত্রণালয় ও ৪০ টি বিভাগে পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশ করছে। মন্ত্রণালয়গুলোকে হ্রাস করার প্রস্তাবের সংযুক্তি-৫-এ রাখা হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.২	মন্ত্রণালয়কে পাঁচটি গুচ্ছে বিভক্ত করাঃ কমিশন সকল মন্ত্রণালয়কে সমপ্রাকৃতির পাঁচটি গুচ্ছে বিভক্ত করার সুপারিশ করছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিম্নলিখিত পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা যেতে পারেঃ (ক) বিধিবদ্ধ প্রশাসন; (খ) অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য, (গ) ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগ; (ঘ) কৃষি ও পরিবেশ; (ঙ) মানব সম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন। মন্ত্রণালয়গুলোকে পাঁচটি গুচ্ছে বিভক্ত করার প্রস্তাব সংযুক্তি-৬-তে দেওয়া হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দণ্ডসমূহের সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো সংস্কারঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের উদ্যোগে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দণ্ডসমূহের সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করতে হবে। তারা তাদের সুপারিশ/প্রস্তাব স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির নিকট প্রেরণ করবে এবং কমিশন তা পর্যালোচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকার প্রধানের নিকট পেশ করবে।	মধ্যমেয়াদি
৬.৪	মন্ত্রণালয়ে নীতি ও পরিকল্পনা ইউনিট শক্তিশালীকরণঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা কোষ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি যাতে আরো কার্যকরভাবে সম্পাদন করা যায় সেজন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে নীতি ও পরিকল্পনা অধিশাখা/অনুবিভাগ গঠন করে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ জনবল নিয়োগ করতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৬.৫	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটকে ডায়নামিক করাঃ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিস্তারিত হালনাগাদ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করবে এবং তাতে নাগরিকদের মতামত (ফিডব্যাক) প্রদানের অপশন রাখতে হবে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.৬	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বাতিল ও 'জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ' বোর্ড ও সচিবালয় গঠনঃ	
(ক)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বাতিল করতঃ এর কার্যক্রম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত/অর্পণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	

(খ)	আন্তঃসার্ভিস সমন্বয়ের জন্য সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানদের সমন্বয়ে ‘জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ’ নামে একটি বোর্ড ও সচিবালয় গঠন করা যেতে পারে। তিন বাহিনী প্রধান প্রতি বছর আবর্তক ভিত্তিতে এ বোর্ডের সভাপতি হবেন। এ ছাড়া স্ব বাহিনীর পদোন্নতি নিজস্ব পদোন্নতি বোর্ডের মাধ্যমে হবে। তবে ব্রিগেডিয়ার/সমমানের বা তদূর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের পূর্বানুমতি নিতে হবে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.৭	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পুনর্গঠনঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে একই কর্মকর্তাকে দ্বৈত দায়িত্ব থেকে আলাদা করে একজন সচিবের নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করবে। নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য তিনটি দপ্তর থাকবে। যথাঃ (ক) আয়কর অধিদপ্তর, (খ) শুল্ক ও আবগারী অধিদপ্তর, (গ) মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অধিদপ্তর। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে নতুন বিশেষজ্ঞ জনবল দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। নবগঠিত তিনটি অধিদপ্তর-এর জন্য আলাদা আলাদা মহাপাচিলক পদ সূজন করে জনবল পুনর্বিন্যাস করতে হবে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.৮	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে আলাদা করাট ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে আলাদা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে একীভূত করা যেতে পারে।	
৬.৯	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰো পুনর্গঠনঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰোর কার্যক্রমকে অধিকতর আস্থাবান ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ‘বাংলাদেশ পরিসংখ্যান কমিশন’ হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য সুপারিশ করা হলো। একটি স্বাধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জন্য আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.১০	বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষঃ বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ রঞ্জানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ (বেপজা), অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ, রঞ্জানি উন্নয়ন ব্যৱৰোর মত একই ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে একীভূত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	স্বল্পমেয়াদি
৬.১১	নতুন দুটি বিভাগ গঠনঃ বর্তমানে দেশে মোট ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে। ভৌগোলিক ও যাতায়াতের সুবিধা বিবেচনায় কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগ গঠনের দাবি অনেক দিনের। সুতৰাং কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করার সুপারিশ করা হলো। জনসংখ্যা ও যোগাযোগের বিবেচনায় দশটি বিভাগকে পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাবের বিবরণ সংযুক্তি-৭-এ দেওয়া হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.১২	‘জেলা প্রশাসক’ ও ‘উপজেলা নির্বাহী অফিসার’ পদবি পরিবর্তনঃ ‘জেলা প্রশাসক’ ও ‘উপজেলা নির্বাহী অফিসার’ পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে ‘উপজেলা কমিশনার’ (Sub-District Commissioner, SDC) ও ‘জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার’ (District Magistrate & District Commissioner, DC) করার জন্য সুপারিশ করা হলো। ‘অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)’ পদবি পরিবর্তন করে ‘অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা)’ করা যেতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.১৩	জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানঃ জেলা কমিশনারকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। তিনি অভিযোগগুলো তদন্তের জন্য উপজেলার কোনো কর্মকর্তাকে বা সমাজের ছানায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে সালিশী বা তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারবেন। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হলে থানাকে মামলা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবেন। পরবর্তীতে মামলাটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় আদালতে চলে যাবে। এর ফলে সাধারণ নাগরিকরা সহজে মামলা করার সুযোগ পাবেন। অপরদিকে, সমাজের ছেটোখাটো বিরোধ আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আদালতের উপর অযৌক্তিক মামলার চাপ করে যাবে। তবে এরপ ক্ষেত্রে অভিযোগকারী একই বিষয়ে পুনরায় আদালতে যেতে পারবেন না। এ সুপারিশের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি

৬.১৪	উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনঃ উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা হলে সাধারণ নাগরিকগণ অনেক বেশি উপকৃত হবে। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.১৫	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসারঃ থানার ‘অফিসার-ইন চার্জ’ এর কাজ ও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার তদারকীর জন্য উপজেলা পর্যায়ে একজন সহকারী পুলিশ সুপারকে ‘উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার’ হিসেবে পদায়ন করা যেতে পারে। এর ফলে থানার জবাবদিহিতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।	স্বল্পমেয়াদি
৬.১৬	পৃথক ইমিগ্রেশন অফিসার নিয়োগঃ বর্তমানে বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনে পুলিশ অফিসারগণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। পুলিশ অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ অনেক সময় যাত্রী-বাহ্যের হয় না। বিশ্বের বহু দেশে পুলিশের পরিবর্তে আলাদা ইমিগ্রেশন অফিসার নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশেও যোগ্যতার ভিত্তিতে পৃথক ইমিগ্রেশন অফিসার নিয়োগ করার সুপারিশ করা হলো। তবে পুলিশ থেকে ২০% ডেপুটেশনে রাখা যেতে পারে। ইমিগ্রেশন অফিসারদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৬.১৭	ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস সংস্কারঃ ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস বর্তমানে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে থাকে। অপরদিকে, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন অফিস ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর সংক্রান্ত দুটি আলাদা অফিস থাকায় জনদুর্ভোগ ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় একান্ত ব্যবস্থাপনা বাতিল করে ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	স্বল্পমেয়াদি
৬.১৮	সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনাঃ বর্তমানে জমি ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রি করার ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে সময় সাধান সঠিকভাবে হয় না। সাম্প্রতিককালে ভূমি অফিসে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হলেও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এখন পর্যন্ত ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আসেনি। এমতাবস্থায়, দুটো অফিসকে অবিলম্বে একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে এনে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকেও ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এনে একটিকে অপরটির সাথে সংযোগ করে দিতে হবে যাতে জমি সংক্রান্ত তথ্য উভয়ের কাজে সহজলভ্য হয়।	মধ্যমেয়াদি
৬.১৯	নিকাহ নিবন্ধন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। এরপে ক্ষেত্রে আপিলের কোনো বিষয় থাকলে তা বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে নিষ্পত্তি করার সুপারিশ করা হলো।	স্বল্পমেয়াদি
৬.২০	প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করাঃ	
ক)	দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সরকারের কার্যপরিধি সুবিধ্ত হওয়ার ফলে বর্তমান প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার কাঠামো যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় না। অপরদিকে, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রণালয় পর্যায়ে খুঁটিনাটি বহু কাজ সম্পাদন করা হয়। ক্ষমতার প্রত্যর্পণ (ডেলিগেশন) বিবেচনায় দেশে বিশাল জনসংখ্যার পরিমেবো ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এর ফলে এককেন্দ্রীক সরকারের পক্ষে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ হ্রাস পাবে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা শহরের উপর চাপ হ্রাস পাবে। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য।	মধ্যমেয়াদি
খ)	রাজধানী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ও পরিমেবোর ব্যাপ্তির কথা বিবেচনায় রেখে নয়া দিল্লীর মতো ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রিত ‘ক্যাপিটাল সিটি গর্ভনেমেন্ট’ বা ‘রাজধানী মহানগর সরকার’ (Capital City Government) গঠনের সুপারিশ করা হলো। অন্যান্য প্রদেশের মতই এখানেও নির্বাচিত আইন সভা ও স্থানীয় সরকার থাকবে। ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে ‘ক্যাপিটাল সিটি গর্ভনেমেন্ট’-এর আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি

৬.২১	জেলা পরিষদ বাতিলঃ স্থানীয় সরকারের একটি ধাপ হিসেবে জেলা পরিষদ বহাল থাকবে কিনা সে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা রয়েছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কখনোই নাগরিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হননি। কিছু জেলা পরিষদ বাদে অধিকাংশেরই নিজস্ব রাজস্বের শক্তিশালী উৎস নেই। ফলে অধিকাংশ জেলা পরিষদ অর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেহেতু জেলা পরিষদ বাতিল করা যেতে পারে। জেলা পরিষদের সহায়-সম্পদ প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তর করা যেতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি
৬.২২	পৌরসভা শক্তিশালীকরণঃ পৌরসভার গুরুত্ব বিবেচনায় স্থানীয় সরকার হিসেবে একে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হলো। পৌরসভা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেষ্ঠারদের ভোটে। কারণ চেয়ারম্যান একবার নির্বাচিত হলে মেষ্ঠারদের আর গুরুত্ব দেয় না।	মধ্যমেয়াদি
৬.২৩	উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করাঃ	
ক)	স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা পরিষদকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হলো। তবে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বাতিল করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	উপজেলা পরিষদকে আরো জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবন্দ বিষয়াদি যেমন আইনশৃঙ্খলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। এর উদ্দেশ্য তাকে রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রাখা। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।	স্বল্পমেয়াদি
ঘ)	ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণির একজন ভূমি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মরত কানুনগোদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অধীনে তাদের পদোন্নতি ও পদায়ন করা যেতে পারে। এরপ পদোন্নতির পরীক্ষা পিএসসি-র মাধ্যমে হতে হবে। পরবর্তীতে তারা পদোন্নতি পেয়ে ২৫% সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে পারবে।	মধ্যমেয়াদি
৬.২৪	ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কারঃ ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯-১১ করা যেতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইজন সদস্য নির্বাচিত হবেন, যাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা হতে হবে বলে বিধান করার সুপারিশ করা হলো। এর ফলে একদিকে মহিলাদের ৫০% প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের কর্মএলাকা সুনিশ্চিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন মেষ্ঠারদের ভোটে। কারণ চেয়ারম্যান একবার নির্বাচিত হলে মেষ্ঠারদের আর গুরুত্ব দেয় না।	মধ্যমেয়াদি
৬.২৫	ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর দায়িত্ব দেওয়াঃ	
ক)	উপানুষ্ঠানিক ও মসজিদিভিতিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কৃষি ও পানি বিষয়ক কমিটি গঠন করা যেতে পারে। একইভাবে পরিষেবা সংক্রান্ত ঘাস্ত্বসেবা কমিটিসহ ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে যে গ্রাম আদালত বা সালিশী ব্যবস্থা রয়েছে তাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা হলে গ্রাম পর্যায়ে মামলা-বিরোধ ইত্যাদি কর্মে আসবে।	মধ্যমেয়াদি
ঘ)	এলাকার জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গনশুনানির মাধ্যমে এসকল কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটিসমূহের কার্যক্রমে তাদের উপস্থিত থাকার সুযোগ দিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় সাত

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কাঠামো ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার

ক। সমন্বিত ক্যাডার সার্ভিসের সংস্কারঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যে ক্যাডার সার্ভিসের ধারণা রয়েছে তার সংস্কার প্রয়োজন। ‘ক্যাডার’ পরিভাষাটির মধ্য দিয়ে নানাবিধ বৈময় ও অভিযোগের উপলক্ষ তৈরি হচ্ছে। সমাজে একটা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রয়োজনে যে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সার্ভিস থাকা দরকার ক্যাডার নামকরণে তা প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং সার্ভিসগুলোর নামকরণও তার স্বয়ন্ধ্যাত হওয়া উচিত। যেমন বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সার্ভিস, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস, বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস, বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস ইত্যাদি। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ডিজিটাল গবর্ন্যান্সের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলায় নতুন পরিষেবা হিসাবে আইসিটি এবং সাইবার নিরপত্তা পরিষেবা চালু করা উচিত। দক্ষ ও কার্যকর জনসেবা প্রদানের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের আধুনিক প্রয়োজনীয়তা সাথে সিভিল সার্ভিসকে উন্নত করা প্রয়োজন। কারিগরী পদগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য উদ্যোগ নেয়া উচিত; কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় প্রশাসন ক্যাডারের অনুকূলে বেশি সুযোগসুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি রয়েছে বলে অন্যান্য সার্ভিস থেকে অভিযোগ করা হয়। এই ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে ডাঙ্গার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের মতো পেশাদারদের প্রশাসন ক্যাডারে যোগদানে আকৃষ্ট করে। ফলেশ্বরিতে উন্নেখযোগ্যভাবে সরকারি সম্পদ ও দক্ষতার অপচয় ঘটে।

খ। পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনঃ সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকার দলীয় লোকদের দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন এবং সরকার দলীয় অযোগ্য যুব ও ছাত্রদের চাকরিতে যোগদানের সুযোগ রহিত করতে হবে। এজন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের জন্য একজন বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় ও গ্রহণযোগ্য লোকদের নিয়ে সার্চ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এভাবে গঠিত সার্চ কমিটি স্বাধীনভাবে বিবেচনা করে জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ লোকদের নিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করবেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান করতে হবে।

অপরদিকে, বাংলাদেশের সংবিধানে একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দু'টো পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়েছিলঃ একটি ক্যাডার সার্ভিসের জন্য এবং অপরটি নন-ক্যাডার সার্ভিসের জন্য। পরবর্তীতে দু'টোকে একীভূত করা হয়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য এখন একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষা সার্ভিস ও স্বাস্থ্য সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অন্যান্য সার্ভিস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনে। তাদের পরীক্ষা ও প্রশ্নের ধরনও আলাদা। তাই পৃথক পৃথক সার্ভিস কমিশন গঠন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

গ। মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসঃ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষাকে মনে করা হয় মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস গড়ার প্রধান হাতিয়ার। সেমতে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে উর্তৃীয় প্রার্থীদেরকে দেশের অন্যতম মেধাবী সন্তান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে অনেকেই মনে করেন যে, বর্তমানে বিসিএস-এর মূল লিখিত পরীক্ষায় যে সিলেবাস রয়েছে তা দিয়ে কোনোভাবেই প্রার্থীদের প্রকৃত মেধা যাচাই করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ, সাধারণ ক্যাডারদের জন্য বর্তমানে বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসটিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

- (১) সাধারণ বাংলা দুই পেপার ২০০ নম্বর
- (২) সাধারণ ইংরেজি দুই পেপার ২০০ নম্বর
- (৩) বাংলাদেশ বিষয়াবলি (Affairs) দুই পেপার ২০০ নম্বর
- (৪) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি এক পেপার ১০০ নম্বর
- (৫) গাণিতিক যুক্তি এবং মানসিক সামর্থ্য এক পেপার ১০০ নম্বর এবং
- (৬) সাধারণ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি এক পেপার ১০০ নম্বর।

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমানে বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় ৬টি বিষয়ে ৯টি পেপারের অধীনে মোট ৯০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয়। এ সবগুলো বিষয় বা পেপারই আবশ্যিক (Compulsory)। এর বাইরে সাধারণ ক্যাডারের জন্য বর্তমান বিসিএস সিলেবাসে কোনো ঐচ্ছিক (Elective) বিষয় নেই। টেকনিকাল ক্যাডারসমূহের জন্যও প্রায় অনুরূপ সিলেবাস রয়েছে, তবে তাদের সিলেবাসে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট ও বিষয়ভিত্তিক দুটো অতিরিক্ত পেপার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সাধারণ ক্যাডারদের জন্য প্রযোজ্য ‘সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে। সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বর্তমানের বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি বলতে গেলে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সিলেবাসের সমতুল্য। তার অর্থ বর্তমান বিসিএস সিলেবাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা হয় এমন বৃদ্ধিভিত্তিক বিষয়, যেমন- ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লোক প্রশাসন, ইসাব বিজ্ঞান, ফাইন্যান্স, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, মেডিকেল সায়েন্স, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সুতরাং মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের সিলেবাসে পরীক্ষা নিয়ে বিসিএস চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হলে তা দ্বারা কীভাবে মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস গঠন করা সম্ভব- সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তাছাড়া, বর্তমান বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসকে ধারণা করা হয়, বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী তথ্য ডাক্তার, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্রদের জন্যই বেশি সহায়ক।

ঘ। আন্তঃক্যাডার ক্যাডার সমতা আন্যানঃ সরকারি খাতে আসন্ন সংক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তঃক্যাডার এবং ক্যাডার, নন-ক্যাডার সমতা আন্যানের জন্য কার্যকর উদ্দেশ্য গ্রহণ করা দরকার। জনপ্রশাসনে বিভিন্ন প্রকারের ভিন্নতা ত্রাসের জন্য মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতির নিয়ম চালু করা উচিত। প্রত্যেক সার্ভিসের অধিকতর দক্ষ ও চৌকষ কর্মকর্তারা যাতে নিজস্ব সংস্কার উচ্চতর পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি পেতে পারে সেজন্য বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন সার্ভিসের মধ্যে যে অসমতা রয়েছে বিশেষ করে যে সব সার্ভিসে ১ থেকে ৪ গ্রেড পর্যন্ত পদ নেই তা সমাধানের জন্য চাহিদার নিরিখে প্রত্যেক সার্ভিসে গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৪ এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ঙ। ‘সুপারিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ গঠনঃ সচিবালয়ের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে নিয়োগ পাওয়ার প্রত্যাশা বিভিন্ন সার্ভিস কর্মকর্তাদের আকাঙ্গা থাকে। যেহেতু সিভিল সার্ভিস কাঠামোটি পিরামিডের মত, সেহেতু শীর্ষ পদে সকলের যাওয়ার সুযোগ রাখা যায় না। সেক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে (মেরিটোক্রাসি) উচ্চতর পদগুলোতে আরোহনের সুযোগ সৃষ্টি করাই যুক্তিসংজ্ঞত। বিশেষ বহু দশেই এ নীতি অনুসরণ করা হয়। অতীতে জনপ্রশাসন সংক্ষার কমিশন (২০০০) এবং বেতন ও চাকরি কমিশন (১৯৭৭) এবং প্রশাসনিক ও পরিষেবা পুনর্গঠন কমিটি (১৯৭২)-এর উপসচিব, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদগুলো নিয়ে একটি প্রথক সিনিয়র সার্ভিস গঠন করার সুপারিশ করেছিল। এমতাবস্থায়, এই কমিশন মনে করে যে, মন্ত্রণালয়ের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদগুলো নিয়ে ‘সুপারিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ (এসইএস) গঠিত হতে পারে। সকল সার্ভিস থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে এসইএস-এ নিয়োগ করা হলে একদিকে মেধার প্রাধান্য নিশ্চিত হবে; অপরদিকে, আন্তঃসার্ভিস সমতা আন্যান হবে। বাস্তবতার নিরিখে প্রশাসনিক সার্ভিসের মেধা, দক্ষতা ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় বর্তমানে উপসচিব পদের ৭৫% উক্ত সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা রাখা আছে। আন্তঃসার্ভিস অসমতা দূর করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কমিশন প্রশাসনিক সার্ভিসের ৭৫% কোটা হাস করে ৫০% করার বিষয়টি অধিকতর যৌক্তিক মনে করছে। অবশিষ্ট ৫০% পদ অন্যান্য সার্ভিস ও পার্শ্ব নিরোগ (lateral entry)-এর জন্য উচ্চ রাখা কমিশন সমীচীন মনে করে। তবে বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে একটি মামলার রায় ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপসচিবের পদটি সবার জন্য উন্নত থাকবে এবং সকল বিদ্যমান ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এসইএস-এ অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। এটি কর্মজীবনের অগ্রগতিতে ন্যায্যতা, যোগ্যতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করবে। কর্মকর্তাগণ একবার এসইএস-এ অন্তর্ভুক্ত হলে কর্মকর্তাদের অধিকতর বিশেষায়িত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে কর্মকর্তাগণ কর্মজীবনে যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব ও মুখ্য সচিব (প্রিসিপাল সেক্রেটারী) হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

চ। মুখ্য সচিব (**Principal Secretary**) পদের যৌক্তিকীকরণঃ বিভিন্ন দেশে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আলাদাভাবে মুখ্য সচিব (প্রিসিপাল সেক্রেটারী) পদ থাকায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রিসিপাল সেক্রেটারীর মধ্যে একমত্য ও সময়সূচীর অভাবে কখনো সিদ্ধান্তসংজ্ঞ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আকারে ছোট করা যুক্তিসংজ্ঞত হবে বলে কমিশন মনে করে। অপরদিকে, মন্ত্রণালয়গুলোর সংখ্যা হ্রাস করা হলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে একাধিক বিভাগ সংযুক্ত হবে। ফলে একই মন্ত্রীর অধীনে একাধিক বিভাগের সময়ের জন্য একটি করে মুখ্য সচিব (প্রিসিপাল সেক্রেটারী) পদ সৃষ্টি করা যাবে। বর্তমান ‘সিনিয়র সচিব’ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের এ পদে পদায়ন করা যেতে পারে। ভারতসহ বিভিন্ন দেশে এরূপ নিয়ম রয়েছে। বর্তমান ‘সিনিয়র সচিব’ নামকরণ বাদ দেয়া যেতে পারে। কারণ, এতে বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে। আবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রিসিপাল সেক্রেটারী ও সচিব পদের কোনো বেতন গ্রেড বা ক্ষেত্র থাকবে না। সরকার তাদের বেতন-ভাতা ও সুবিধাদি নির্ধারণ করবেন।

ছ। সুপারিশমালাঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কাঠামো ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার

৭.১	<p>বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পুনর্গঠনঃ</p> <p>(ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)-এর আওতায় একীভূত (Unified) ‘ক্যাডার’ সার্ভিস বাতিল করে তার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সার্ভিসের কাজের ধরন ও বিশেষায়িত দক্ষতার বিষয়টি সামনে রেখে আলাদা আলাদা নামকরণ করা যেতে পারে। বিদ্যমান বিসিএস-এর বিভিন্ন ক্যাডারগুলোকে নিম্নলিখিত ১২টি প্রধান সার্ভিসে বিভক্ত করার সুপারিশ করা হলোঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস (Bangladesh Administrative Service) ২. বাংলাদেশ বিচারিক সার্ভিস (Bangladesh Judicial Service) ৩. বাংলাদেশ জননিরাপত্তা সার্ভিস (Bangladesh Public Security Service) ৪. বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সার্ভিস (Bangladesh Foreign Service) ৫. বাংলাদেশ হিসাব সার্ভিস (Bangladesh Accounts Service) ৬. বাংলাদেশ নিরীক্ষা সার্ভিস (Bangladesh Audit Service) ৭. বাংলাদেশ রাজ্য সার্ভিস (Bangladesh Revenue Service) ৮. বাংলাদেশ প্রকৌশল সার্ভিস (Bangladesh Engineering Service) ৯. বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস (Bangladesh Education Service) ১০. বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস (Bangladesh Health Service) ১১. বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিস (Bangladesh Agriculture Service) ১২. বাংলাদেশ তথ্য সার্ভিস (Bangladesh Information Service) ১৩. বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভিস (Bangladesh Railway Service) ১৪. বাংলাদেশ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সার্ভিস (Bangladesh ICT Service) <p>বিভিন্ন সার্ভিসের অন্তর্ভুক্তি, একীভূতকরণ ও নতুন নামকরণ সংযুক্তি-৮-এ দেখানো হয়েছে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২	<p>বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা) সার্ভিসকে দু'টো সার্ভিসে বিভক্তকরণঃ বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা) সার্ভিসকে দু'টো সার্ভিসে বিভক্ত করার সুপারিশ করা হলো। একটি হবে ‘বাংলাদেশ হিসাব সার্ভিস’ ও আরেকটি হবে ‘বাংলাদেশ নিরীক্ষা সার্ভিস’।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.৩	<p>এলজিইডি ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পুনর্গঠনঃ কমিশন সুপারিশ করছে যে, দু'টি সংস্থায় কর্মরত প্রকৌশলীদের প্রকৌশল সার্ভিস হিসেবে একীভূত করার জন্য সুপারিশ করা হলো। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগদানের তারিখ থেকে পারস্পরিক সিনিয়ারিটি নির্ধারণ করা হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.৪	<p>বিসিএস (সাধারণ তথ্য)-এর ৩টি সাব-ক্যাডার একীভূতকরণঃ বিসিএস (সাধারণ তথ্য) ক্যাডারের অধীনে ৩টি সাব-ক্যাডার রয়েছে যাদের মধ্যে পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য রয়েছে। এরূপ বৈষম্য দূর করার জন্য তিনটি সাব-ক্যাডারকে বিলুপ্ত করে তিনটি গ্রঞ্চের (ক) সহকারী পরিচালক/তথ্য অফিসার/গবেষণা কর্মকর্তা, (খ) সহকারী অনুষ্ঠান পরিচালক, এবং (গ) সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক পদসমূহ নিয়ে একটি একীভূত সার্ভিস গঠন করার সুপারিশ করা হলো। সম্মিলিত মেধা তালিকার ভিত্তিতে তাদের জেষ্ঠতা, পদোন্নতি ও পদায়ন করা যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.৫	<p>আইসিটি কর্মকর্তাদেরকে তথ্য সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তকরণঃ</p> <p>(ক) আমাদের সমাজের সর্বস্তরে এবং সরকারি দণ্ডরসমূহে ডিজিটাল পদ্ধতি তথ্য আইসিটি ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে অনেক অঙ্গাংতি হলেও আন্তর্জাতিক বিশ্বের তুলনায় এখনো আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সরকারি দণ্ডের আইসিটি সম্পৃক্ত বহু কর্মচারী এখন কাজ করেন। তাদের অনেকেই বেশ মেধাবীও বটে। অনেকে দেশের বাইরে গিয়েও বেশ সাফল্য দেখাচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারি দণ্ডের আইসিটি কর্মকর্তাদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।</p> <p>(খ) বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল) সার্ভিসকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।</p>	মধ্যমেয়াদি

৭.৬	<p>‘বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ সার্ভিস’ গঠনঃ বিসিএস (বন) সার্ভিসের কর্মকর্তারা বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে থাকে। সময়ের ব্যবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই বিসিএস (বন) সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সাথে পরিবেশ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের একীভূত করে বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিসের উপ-সার্ভিস হিসেবে ‘বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ সার্ভিস’ সংযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.৭	<p>বিসিএস (ট্রেড)-কে একীভূতকরণঃ বিসিএস (ট্রেড) ক্যাডার খুবই ছোট একটি সার্ভিস হওয়ার কারণে একে বিলুপ্ত করে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি)-এর সাথে একীভূত করার জন্য সুপারিশ করা হলো। ডিলিউটিও-এর ট্রিএফএ প্রভিশনগুলোর ৮০% ভাগ উর্ধে কাস্টমস বিভাগ বাস্তবায়ন করে থাকে বিধায় বিদেশে বাংলাদেশের কুটনৈতিক মিশনে ট্রেড কাউন্সিলর পদে কাস্টমস সার্ভিস থেকে পদায়নের সুপারিশ করা হলো। ভবিষ্যতে এ সার্ভিসে নতুন নিয়োগ করা যাবে না।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.৮	<p>বিসিএস (খাদ্য) ও বিসিএস (সমবায়) সার্ভিসকে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসের সাথে একীভূতকরণঃ বিসিএস (খাদ্য) ও বিসিএস (সমবায়) সার্ভিস দু’টোকে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসের সাথে একীভূত করার সুপারিশ করা হলো। ভবিষ্যতে এ দু’টো সার্ভিসে নতুন নিয়োগ করা যাবে না।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.৯	<p>বিসিএস (ডাক) সার্ভিসঃ ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদি যোগাযোগের জন্য সহজলভ্য হওয়ায় বিসিএস (ডাক) সার্ভিসের গুরুত্ব বহুলাংশে হাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় এই সার্ভিসকে ক্রমাগতে বিলুপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা সরকার পরীক্ষা করে দেখতে পারে। যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.১০	<p>পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দু’টো পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়েছিলঃ একটি ক্যাডার সার্ভিসের জন্য এবং অপরটি নন-ক্যাডার সার্ভিসের জন্য। পরবর্তীতে দু’টোকে একীভূত করা হয়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য এখন তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করার সুপারিশ করা হলো। প্রতিটি কমিশনের সদস্য সংখ্যা হবে চেয়ারম্যানসহ ৮ জন। কমিশনগুলো হবেঃ</p> <p>(ক) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ)ঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা</p> <p>(খ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা)ঃ শুধুমাত্র শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা</p> <p>(গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য)ঃ শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা</p> <p>শিক্ষা সার্ভিস ও স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তার অন্যান্য সার্ভিসের সাথে সুপরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।</p>	স্বল্পমেয়াদি
৭.১১	<p>জনপ্রশাসনে মেধাভিত্তিক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানঃ জনপ্রশাসনে মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা/আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে যাতে সহজেই সেটি পরিবর্তন করা না যায়। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী প্রতিষ্ঠা করা উচিত, বিশেষ করে বিসিএস, বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অত্যধিক দীর্ঘ বিধায় নিয়োগ থেকে যোগাদান পর্যন্ত প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করা প্রয়োজন। বিসিএস পরীক্ষার এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি একটি ব্যাপক লিখিত পরীক্ষায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। পিএসি-র পরীক্ষার একটি বার্ষিক ক্যালেন্ডার নিরূপ হতে পারেঃ</p> <p>(ক) পিএসি-র পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ</p> <p>(খ) প্রিলিমিনারী পরীক্ষাঃ এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ</p> <p>(গ) প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফল প্রকাশঃ মে মাসের প্রথম সপ্তাহ</p> <p>(ঘ) মূল লিখিত পরীক্ষাঃ জুন মাসের দ্বিতীয়ার্দে (১০ দিন)</p> <p>(ঙ) মূল লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশঃ ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ</p> <p>(চ) মৌখিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাঃ পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।</p> <p>(ছ) পিএসি কর্তৃক চূড়ান্ত ফল ঘোষণাঃ এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ</p> <p>(জ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ছাড়পত্রঃ মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ</p> <p>(ঝ) নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে যোগদানঃ জুলাই মাসের এক তারিখ</p> <p>(ট) পিএটিসি-র ফাউন্ডেশন ট্রেনিং-এ যোগদানঃ আগস্টের প্রথম সপ্তাহ</p>	মধ্যমেয়াদি

৭.১২	<p>(ক) লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসঃ বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের মূল লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন করে তাতে নিম্নবর্ণিত ৬টি আবশ্যিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১) বাংলা রচনা - ১০০ নম্বর ২) ইংরেজি রচনা - ১০০ নম্বর ৩) ইংরেজি কম্পোজিশন (Composition) এবং প্রেসি (Precis) - ১০০ নম্বর ৪) বাংলাদেশের সংবিধান, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি - ১০০ নম্বর ৫) আন্তর্জাতিক ও চলতি বিষয়াবলি - ১০০ নম্বর ৬) সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ ও পরিবেশ, এবং ভূগোল - ১০০ নম্বর <p>নিয়োগ পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত সংযুক্তি-৯- তে দেখা যেতে পারে।</p> <p>(খ) আরো ৬টি ঐচ্ছিক বিষয়ঃ বিসিএস-এর মূল লিখিত পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও সিলেবাসে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠিত কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং আইন ইত্যাদি গুচ্ছ (Group) হতে ৬টি ঐচ্ছিক বিষয় বা পেপার (প্রতিটি ১০০ নম্বরের) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে কোনো গুচ্ছ হতে দুটির বেশি বিষয় বা পেপার নির্বাচন করা যাবে না। প্রার্থীদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং মন্ত্রান্তরিক গুণাবলি মূল্যায়ন করার জন্য পরীক্ষার ধরনগুলো আপডেট করা উচিত। এজন্য অতিরিক্ত একটি ইন্টিগ্রিটেড পরীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে যা হবে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের প্রাথমিক ট্রিনিং। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উভৌর্গের ন্যূনতম নম্বর ৬০% নির্ধারণের সুপারিশ করা হলো। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিসিএস এর চূড়ান্ত ফলাফল breakdown সহ প্রকাশ করা উচিত, কারণ প্রার্থীদের মধ্যে তাদের প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে বিভাগ রয়েছে। কোনো প্রার্থী পর পর তিনবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারবেন না।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.১৩	‘সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ গঠনঃ	
ক)	<p>সকল সার্ভিস থেকে মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে সচিবালয়ের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদগুলো নিয়ে একটি ‘সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ (এসইএস) গঠনের সুপারিশ করা হলো। সচিবালয়ের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে নিয়োগ পাওয়ার প্রত্যাশা বিভিন্ন সার্ভিস কর্মকর্তাদের নিয়োগ পাওয়ার আকাঞ্চা থাকে। যেহেতু সিভিল সার্ভিস কাঠামো পিরামিডের মত, সেহেতু শীর্ষ পদে সকলের যাওয়ার সুযোগ রাখা যায় না। সেক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে (মেরিটোক্রাসি) উচ্চতর পদগুলোতে আরোহণের সুযোগ প্রদান করাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষ বহু দেশেই এ নীতি অনুসরণ করা হয়। এমতাবস্থায়, মন্ত্রণালয়ের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদগুলো নিয়ে ‘সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ (এসইএস) গঠিত হতে পারে। সকল সার্ভিস থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে এসইএস-এ নিয়োগ করা হলে একদিকে মেধার প্রাধান্য নিশ্চিত হবে; অপরদিকে, আন্তসার্ভিস অসমতা দূর হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
খ)	<p>বাস্তবতার নিরিখে প্রশাসনিক সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় বর্তমানে উপসচিব পদের ৭৫% উক্ত সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত রাখা আছে। সকল সার্ভিসের সমতা বজায় রাখার স্বার্থে এবং জনপ্রশাসনের উচ্চতর পদে মেধাবীদের জন্য সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কমিশন প্রশাসনিক সার্ভিসের ৭৫% কোটা হ্রাস করে ৫০% করার বিষয়টি অধিকতর মৌকাতে মনে করছে। অবশিষ্ট ৫০% পদ অন্যান্য সার্ভিস ও প্রার্থী নিয়োগের (lateral entry) জন্য উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে। তবে বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে একটি মামলার রায় ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, কোনো কর্মকর্তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও ৫০% কোটার কোনো একটি গ্রহণের পদ প্ররূপ না হলে মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোনো গ্রহণের প্রার্থীকে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে।</p>	মধ্যমেয়াদি

গ)	পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে এবং মৌখিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা শেষ করে চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। প্রতি বছর একবার করে তিনটি পদের জন্য আলাদাভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (Competency Assessment) অনুষ্ঠিত হবে উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব। প্রশ্নপত্র ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রতিভা ও বুদ্ধিগুণিকে (IQ & Aptitude) অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে। তবে কেউ একবার উত্তীর্ণ না হতে পারলে তিনি পরের ব্যাচে পরীক্ষা আরেকবার দিতে পারবেন। কমপক্ষে ১০ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোনো সার্ভিসের সিনিয়র স্কেলপ্রাণ্ট কর্মকর্তাগণ এসইএস-এর উপসচিব পদের জন্য আবেদন করে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। পদোন্নতির লিখিত পরীক্ষায় পাশ মার্ক ৭০%, বার্ষিক পারফরমেন্স প্রতিবেদন ১৫% এবং বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ১৫% মার্ক নির্ধারণ করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
ঘ)	‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে সিনিয়রিটি নির্ধারণঃ ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ (এসইএস)-এ প্রবেশের পর সিনিয়রিটি নির্ধারিত হবে সম্মিলিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধাক্রম অনুসূরে। কোনো বিশেষায়িত সার্ভিসের কোনো কর্মকর্তা একবার ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ (SES)-এ প্রবেশের পর তিনি আর তার পূর্বতন সার্ভিসে ফেরত যেতে পারবেন না। এসইএস পরীক্ষার রেজাল্টের ভিত্তিতে সকল সার্ভিসের সদস্যদেও নিয়ে একটি সম্মিলিত মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।	মধ্যমেয়াদি
ঙ)	কোনো কর্মকর্তা এসইএস-এ প্রবেশের পরীক্ষায় উপর্যুক্তি দুই বার অকৃতকার্য হলে তিনি আর পুনরায় কোনো সুযোগ পাবেন না। কোনো কর্মকর্তা কোনো কারণে পদোন্নতি না পেলে তাকে তার কারণ লিখিতভাবে জানাতে হবে। তাকে তার জ্ঞান বা সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
	(এসইএস)-এ অন্তর্ভুক্তি যে সকল কর্মকর্তা বর্তমানে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে কর্মরত আছেন তারা সকলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসইএস-এ অন্তর্ভুক্ত হবেন। সচিব, মুখ্যসচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসইএস-এর সদস্য হবেন।	মধ্যমেয়াদি
৭.১৪	সকল সার্ভিসের জন্য লাইন প্রমোশনঃ বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসের যে সকল কর্মকর্তা এসইএস-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিবেন না বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবেন তারাও ওই সার্ভিসের লাইন প্রমোশন পদ তথা অতিরিক্ত জেলা কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার ও চীফ কমিশনার পদে পদোন্নতি লাভের যোগ্য হবেন। তবে তারা এসইএস-এর সংশ্লিষ্ট পদের সমমান পাবেন না। অপরদিকে, এসইএস এবং এর বাইরে থেকে যারা জেলা প্রশাসক পদে পদোন্নতি/পদায়ন পাবেন তাদের শতকরা হার উক্ত সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট উপর্যুক্ত প্রার্থীদের সমানুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে। নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রস্তাবটি তুলে ধরা হলোঃ	মধ্যমেয়াদি

সারণি-১০: বিভিন্ন সার্ভিসের লাইন প্রমোশনের প্রস্তাৱ

প্রেড	বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস	সুপারিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস	অন্যান্য সার্ভিস যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি
বিশেষ	প্রযোজ্য নয়	কেবিনেট সেক্রেটারী	প্রযোজ্য নয়
বিশেষ	প্রধান কমিশনার	প্রিসিপাল সেক্রেটারী	সংশ্লিষ্ট সার্ভিসের প্রধান (যেমন- চীফ অব হেলথ সার্ভিস)
প্রেড-১	বিভাগীয় কমিশনার	সচিব	মহাপরিচালক
প্রেড-২	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার	অতিরিক্ত সচিব	অতিরিক্ত মহাপরিচালক
প্রেড-৩	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার	যুগ্ম সচিব	পরিচালক

	<table border="1"> <tr> <td>গ্রেড-৫</td><td>অতিরিক্ত জেলা কমিশনার</td><td>উপসচিব</td><td>অতিরিক্ত পরিচালক</td></tr> <tr> <td>গ্রেড-৬</td><td>সিনিয়র সহকারী কমিশনার / উপজেলা কমিশনার</td><td>সিনিয়র সহকারী সচিব</td><td>উপজেলা প্রধান</td></tr> <tr> <td>গ্রেড-৯</td><td>সহকারী কমিশনার</td><td>সহকারী সচিব</td><td>সহকারী পরিচালক</td></tr> </table>	গ্রেড-৫	অতিরিক্ত জেলা কমিশনার	উপসচিব	অতিরিক্ত পরিচালক	গ্রেড-৬	সিনিয়র সহকারী কমিশনার / উপজেলা কমিশনার	সিনিয়র সহকারী সচিব	উপজেলা প্রধান	গ্রেড-৯	সহকারী কমিশনার	সহকারী সচিব	সহকারী পরিচালক	
গ্রেড-৫	অতিরিক্ত জেলা কমিশনার	উপসচিব	অতিরিক্ত পরিচালক											
গ্রেড-৬	সিনিয়র সহকারী কমিশনার / উপজেলা কমিশনার	সিনিয়র সহকারী সচিব	উপজেলা প্রধান											
গ্রেড-৯	সহকারী কমিশনার	সহকারী সচিব	সহকারী পরিচালক											
	<p>সকল সার্ভিসের সকল লাইন পদগুলোকেও একইভাবে উপরে উল্লিখিত রূপে বিন্যস্ত করতে হবে। প্রত্যেক সার্ভিসের কর্মকর্তারা প্রতি ধাপে পাবলিক সার্ভিসের অধীনে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার মাধ্যমে ওই সকল পদে পদোন্নতি পাবেন। তবে তারা উপসচিব পদের জন্য এসইএস পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারবেন। যারা উপসচিব হবেন না, তারা নিজের লাইন পদগুলোতে পদোন্নতি পাবেন। সংস্থাগুলো ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা লাইন পদেন্নতি পেলেও এসইএস কর্মকর্তাদের সমমান পাবেন না; তবে তারা গ্রেড ও বেতন সুবিধা পাবেন।</p>													
৭.১৫	<p>শীর্ষ পদের বদলি ও পদায়নঃ যে সকল সার্ভিসে বর্তমানে সচিব পদমর্যাদার পদ রয়েছে সে পদগুলো অধিদণ্ডের/মাঠ পর্যায়ের নিজের পদ হিসেবে গণ্য হবে। সকল সার্ভিসের এসব শীর্ষ পদ যেমন চীফ অব হেলথ সার্ভিস, চীফ কমিশনার, চীফ অব---সার্ভিস) সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এসকল পদ ব্যতীত অপর সকল পদে বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতি অধিদণ্ড/সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পন্ন হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কেবল এসইএসভুক্ত পদ এবং এসইএস এর বাইরের শীর্ষ পদগুলোর বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি সম্পন্ন করবে।</p>	মধ্যমেয়াদি												
৭.১৬	<p>সশন্ত্ব বাহিনী বিভাগ বাতিল ও ‘জেনেন্ট চীফস অব স্টাফ’ সচিবালয় গঠনঃ (ক) সশন্ত্ব বাহিনী বিভাগ বাতিল করতঃ এর কার্যক্রম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত/অর্পণ করা যেতে পারে। (খ) আন্তঃসার্ভিস সমবয়ের জন্য সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানদের সমন্বয়ে ‘জেনেন্ট চীফস অব স্টাফ’ নামে একটি বোর্ড ও সচিবালয় গঠন করা যেতে পারে। তিন বাহিনী প্রধান প্রতি বছর আবর্তক ভিত্তিতে এ বোর্ডের সভাপতি হবেন। এ ছাড়া স্ব স্ব বাহিনীর পদোন্নতি নিজের পদোন্নতি বোর্ডের মাধ্যমে হবে। তবে ব্রিগেডিয়ার/ সমমান ও তদুর্বৰ্প পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের পূর্বনুরূপ নিতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি												
৭.১৭	<p>পদোন্নতির পূর্বে বিশেষ প্রশিক্ষণঃ প্রতিটি ধাপের পদোন্নতির পূর্বে একজন কর্মকর্তাকে প্রতি ধাপের জন্য নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। যেমন-উপসচিব হওয়ার আগে বুনিয়াদি ও বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কোর্স, যুগ্মসচিব হওয়ার আগে উচ্চতর কোর্স (ACAD) এবং অতিরিক্ত সচিব হওয়ার আগে Senior Staff Course-এর মত সমমানের কোর্স শেষে উত্তীর্ণ হতে হবে। পদোন্নতির পূর্বে একজন কর্মকর্তাকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কোর্স এসেসমেন্টনের ভিত্তিতে সাফল্যের সাথে শেষ করতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি												
৭.১৮	<p>সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটিঃ (ক) একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি অতিরিক্ত সচিবদের মধ্য থেকে বাছাই করে সচিব ও সচিবদের মধ্য থেকে মুখ্য সচিব পদে পদোন্নতির প্রস্তাব সরকার প্রধানের কাছে পেশ করবে। বর্তমান সুপ্রিয় সিলেকশন বোর্ড বাতিল করা যেতে পারে। (খ) অতিরিক্ত সচিবদের মধ্য থেকে সচিব নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনাময় অফিসারদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার মত তারা যোগ্য হতে পারে।</p>	স্বল্পমেয়াদি												
৭.১৯	<p>পদোন্নতি না পেলে বেতন সুবিধাঃ কোনো কর্মচারী যদি কোনো পদে পদোন্নতির সর্বোচ্চ ধাপে পৌছে যান এবং এরপরে আর ইনক্রিমেন্ট না পেয়ে থাকেন এবং তিনি যদি কোনো বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ডে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন, তবে তাকে দুই বছর পর পরবর্তী বেতন ক্ষেত্রে প্রদানের সুপারিশ করা হলো।</p>	স্বল্পমেয়াদি												
৭.২০	<p>পার্শ্ব নিয়োগঃ সুপ্রিয় এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের বাইরে ৫% পদে সরকার বিশেষ কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে চুক্তিভিত্তিক যুগ্মসচিব বা সংস্থা প্রধান পদে নিয়োগ দিতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বানের পরে মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিয়োগ হতে হবে। এ ছাড়া তাদেরকে দায়িত্ব প্রদানের আগে কমপক্ষে তিন মাস ওরিয়েন্টেশন কোর্স সমাপ্ত করার বিধান করতে হবে।</p>	স্বল্পমেয়াদি												

৭.২১	<p>মুখ্য সচিব (Principal Secretary) পদে পদায়নঃ মন্ত্রণালয়গুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা হলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে একাধিক বিভাগ সৃষ্টি হবে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য সে সকল মন্ত্রণালয়ে কর্মরত একজন সচিবকে মুখ্য সচিব (Principal Secretary) হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। বর্তমান সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে এ পদে পদায়ন করা যেতে পারে। বর্তমান 'সিনিয়র সচিব' নামকরণ বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও সচিব পদে কোনো বেতন ছেড় বা ক্ষেপ থাকবে না। সরকার তাদের বেতন-ভাতা ও সুবিধাদি নির্ধারণ করবেন।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২১	<p>সকল ক্যাডরের লাইন প্রমোশন নিশ্চিত করাঃ যে সব সার্ভিসের মধ্যে ১ থেকে ৪ ছেড় পর্যন্ত পদ নেই তা সমাধানের জন্য প্রত্যেক সার্ভিসে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছেড়-১ থেকে ছেড়-৪ এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। একইভাবে নির্দিষ্ট সার্ভিসের কর্মপরিধির চাহিদার সমানুপাতিক হারে পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন ছেড়ের পদ সৃষ্টি করার জন্য সুপারিশ করা হলো। সংশ্লিষ্ট সার্ভিসের ৫ম ও ৩য় ছেড়ের সমমানের পদে পদোন্নতির জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষা/ মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২২	<p>শূন্য পদ ব্যতীত পদোন্নতি না দেয়াঃ বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, শূন্য পদের চেয়ে অধিক সংখ্যক পদে পদোন্নতি দিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়। এরপ প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। কেবলমাত্র শূন্যপদের বিপরীতে সমসংখ্যক পদে পদোন্নতি দেওয়ার বিধান করার জন্য সুপারিশ করা হলো।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২৩	<p>মাঠ প্রশাসনের জন্য আইন/বিধি প্রয়োগ বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন বৃটিশ ভারত ও পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন ঐতিহ্য ও বিধিবিধান অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানে মাঠ প্রশাসনের জন্য আলাদা আইন থাকলেও বাংলাদেশে তা নেই। এ কারণে মাঠ প্রশাসনে অনেক সময় বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য মাঠ প্রশাসনের জন্য আলাদা আইন প্রয়োগ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২৪	<p>নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের এসইএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগঃ নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের স্নাতক ও মাস্টার্স পরীক্ষায় কমপক্ষে ৩.৫ ছেড়ে পয়েন্ট রয়েছে ও ১৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদেরকে উপসচিব পদোন্নতির পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২৫	<p>প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগঃ কোনো সংস্থায় নিজস্ব যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা থাকলে সেখানে প্রেষণে কোনো কর্মকর্তাকে পদায়ন না করার জন্য সুপারিশ করা হলো। অপরদিকে, বিভিন্ন অসামরিক পদে প্রেষণে নিয়োগ করার প্রবণতা দেখা যায়। এমতাবস্থায় কমিশন মনে করে যে, সামরিক বাহিনীতে কর্মরত কোনো কর্মকর্তাকে অসামরিক পদে প্রেষণে নিয়োগ করা সমীচীন হবে না। তবে অবসরণাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের বেলায় এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২৬	<p>চলতি দায়িত্ব প্রদানঃ কোনো পদে পদোন্নতির যোগ্য কর্মকর্তা থাকলে তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান না করে তাকে পদোন্নতি দিতে হবে। তবে কোনো পদে পদোন্নতির যোগ্য কর্মচারী না থাকলে সিনিয়র কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করার সুপারিশ করা হলো।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২৭	<p>কর্মচারীদের বদলি করার ক্ষমতা প্রত্যর্পন করাঃ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ব্যতীত উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা প্রধান বদলি করবেন বলে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো। একইভাবে বিভাগীয় কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে বদলি করার ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২৮	<p>সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয়ের লোনঃ সচিবালয়ের উপসচিবদের গাড়ি ক্রয়ের খণ এবং গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সুযোগ সচিবালয়ের বাইরে অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের জন্য নেই। এ ব্যবস্থা বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। এতে একদিকে বৈষম্য দূর হবে এবং অপরদিকে, সরকারের ব্যয় হ্রাস পাবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৭.২৯	<p>বেতন ক্ষেপ নির্ধারণঃ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত ইনডেক্স বিশ্লেষণ করে মূল বেতন প্রতি বছর বেতন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে তা সাথে ৫% এর বেশি হবে না। এ উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি

৭.৩০	অবসর নেয়ার অনুমতিঃ প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী ১৫ (পনের) বছর চাকরি করার পর সকল সুবিধাসহ অবসর নেয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো। এটি কর্মজীবন পরিবর্তনের জন্য বেছে নেয়া কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রস্থান পথের সুবিধা দিবে।	মধ্যমেয়াদি
৭.৩১	বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের প্রথাঃ পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮ এর ধারা ৪৫ বিধান অনুসারে ২৫ বছর চাকরির পরে সরকার ইচ্ছে করলে কাউকে বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারে বলে যে বিধান রয়েছে তা বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। নিরপেক্ষ জনপ্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য একই সুপারিশ করা হয়েছে।	স্বল্পমেয়াদি
৭.৩২	অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি): সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত কোনো অফিসার/কর্মচারীকে ওএসডি না করার জন্য সুপারিশ করা হলো। কোনো ওএসডি কর্মকর্তাকে কাজ না দিয়ে বেতন-ভাতা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে শিক্ষকতা বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাময়িকভাবে পদায়ন করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৭.৩৩	সচিবালয়ে পদায়নঃ সচিবালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে কমপক্ষে দুই বছর চাকরি করেছে এমন কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সমমানের পদে পোস্টিং পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৭.৩৪	সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতিঃ একজন সহকারী কমিশনার মাঠ পর্যায়ে কমপক্ষে চার বছর চাকরি করার পরে মেধাভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি পাবেন বলে সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি
৭.৩৫	স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে মাদকাসক্তি পরীক্ষাঃ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর যখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় তখন প্রার্থী মাদকাসক্ত কিনা তাও পরীক্ষা করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি
৭.৩৬	ব্লক পদে নারীদের নিয়োগঃ যে সকল পদকে ব্লক পদ বলে গণ্য করা হয় সে সব পদে নারীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো। উপজেলা পর্যায়ের এ ধরনের পদে পুরুষ কর্মচারীদের অন্য উপজেলায় বদলি করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৭.৩৭	দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পদে নিয়োগঃ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে সরকারি চাকরির দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পদে নিয়োগের জন্য একটি প্রাদেশিক কর্ম কমিশন গঠন করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৭.৩৮	উপজেলা পর্যায়ে কর্মচারীদের কাজে অনীহাঃ মাঠ পর্যায়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্যে কাজে অবহেলা ও নাগরিকদের সাথে ভালো আচরণ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ অবস্থা দূর করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশের অফিসার ইন চার্জ, থানা স্বাস্থ্য প্রশাসক, থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি কমিশনারকে নিয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	মধ্য মেয়াদি
৭.৩৯	জনপ্রশাসনে ক্যারিয়ার প্লানিংঃ জনপ্রশাসনকে একটি দক্ষ ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ক্যারিয়ার প্লানিং অনুবিভাগকে উপযুক্ত কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুনর্গঠন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় আট

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংক্ষার

ক। জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতার গুরুত্বঃ প্রশাসনে জবাবদিহিতার অর্থ হলো, সকল সরকারি দণ্ডের বা সংস্থা এবং এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দাঙ্গারিক সিদ্ধান্ত, কর্মকাণ্ড এবং কর্ম-ফলাফলের (Performance) জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাংবিধানিক এবং বিশুল্পতার (Fiduciary) নীতিসমূহ এটা দাবি করে যে, যারা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করবেন, তারা এরপ ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন এটা নিশ্চিত করে যে, সরকারি কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাজের উচ্চমান এবং নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

সরকারি কর্মকর্তারা তাদের সহকর্মী, নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা, উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন অডিটর জেনারেলের অফিস, ন্যায়পাল এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির (গোবিন্দ একাউন্টস্ কমিটি) কাছে জবাবদিহি করে থাকেন। জবাবদিহিতার সম্পর্কটি দু'টি পক্ষের মাধ্যমে কার্যকর হয়ঃ (১) একটি জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ পক্ষ, এবং অপরাটি (২) জবাবদিহিতার জন্য দায়ী পক্ষ। জবাবদিহিতার জন্য দায়ী পক্ষকে তাদের সকল কার্যক্রমের জন্য প্রতিবেদন দাখিল এবং কাজের যৌক্তিকতার সপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে হয়। অপরাটিকে, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ পক্ষের কাজ হচ্ছে জবাবদিহিতার জন্য দায়ী পক্ষকে কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি প্রদান।

খ। জবাবদিহিতার প্রকার-ভেদঃ জবাবদিহিতার বিভিন্ন প্রকার-ভেদে রয়েছে, যেমন উল্লম্ব (Vertical), অনুভূমিক (Horizontal), ত্রিভূজীয় (Diagonal), সরাসরি (Direct), পরোক্ষ (Indirect) এবং সামাজিক (Social)। উল্লম্ব জবাবদিহিতা ঘটে যখন নাগরিকেরা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। অনুভূমিক জবাবদিহিতার হলো রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ত্রিভূজীয় জবাবদিহিতা হলো সুশীল সমাজের সংগঠন এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারির ব্যবস্থা। সাধারণত বিভিন্ন সরকারি জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবেই জবাবদিহিতা বেশি নিশ্চিত করা হয়। তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সরাসরি জবাবদিহিতাও সম্ভব, যেমন- সাধারণ এবং স্থানীয় নির্বাচন, গণভোট, সামাজিক মাধ্যম, সামাজিক নিরীক্ষা এবং স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনসম্প্রৃততা। জবাবদিহিতা যেকোন গণতান্ত্রিক প্রশাসনের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্বীতি এবং অনিয়ন্ত্রিত কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

গ। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতাঃ সরকারি খাতে স্বচ্ছতার অর্থ হলো সরকারি কর্মকর্তারা তাদের সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমের ফলাফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত রেখে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করবেন। জনগণ যেন সহজেই সরকারি তথ্য পেতে পারে স্বচ্ছতা তা নিশ্চিত করে, যাতে করে তারা সরকারের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে পারে। জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা সুশীলনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বচ্ছতা দুর্বীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, শাসনব্যবস্থা উন্নত করতে এবং জবাবদিহিতা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, কারণ তারা অনেক ক্ষেত্রে একই কাজের অতির্ভুক্ত যেমন-জনপ্রতিবেদন (Public Reporting)।

ঘ। কর্ম-সম্পাদন ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতাঃ কর্ম-সম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Performance Management) হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা সংস্থাগুলোকে লক্ষ্য নির্ধারণ, কার্য-ক্ষমতা উন্নতকরণ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। কর্ম-সম্পাদন (Performance) ব্যবস্থাপনা সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কৌশল প্রয়োগ, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা (Change Management) এবং জবাবদিহি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে। কর্ম-সম্পাদন ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি খাতের জবাবদিহিতা উভয়ই জন-প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এ দু'টিকে একসঙ্গে ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের দক্ষতা এবং জনসেবার মান উন্নত করা যেতে পারে।

ঙ। বাংলাদেশের সরকারি খাতের জবাবদিহিতার কাঠামোঃ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সরকারি খাতের জবাবদিহিতা প্রথমত রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ, যথা (১) আইনসভা, (২) নির্বাহী বিভাগ, (৩) বিচার বিভাগ-এর পৃথকীকরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এ তিনটি বিভাগ একে অপরের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ও ভারসাম্য বজায় রাখে, যাতে করে নির্বাহী বিভাগ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা জনগণের উপর অপব্যবহার না করতে পারে। অন্যান্য সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ন্যায় বাংলাদেশেও মন্ত্রীগণ বা কেবিনেট সরকারের কর্ম-ফলাফলের (Performance) জন্য সংসদের কাছে মৌখিকভাবে এবং তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের কার্য-সম্পাদনের জন্য পৃথকভাবে দায়বদ্ধ। সংসদ সদস্যরা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করেন। অন্যদিকে, নিম্নলিখিতের সরকারি কর্মকর্তারা দণ্ডের প্রধানের কাছে, দণ্ডের প্রধান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে, সচিব মন্ত্রীর কাছে এবং মন্ত্রী সংসদের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহি করেন। এই জবাবদিহিতার প্রবাহ চিত্র (Chain) নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হলোঃ

চ। কম্পটোলার এবং অডিটর জেনারেল (CAG): বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কম্পটোলার ও অডিটর জেনারেলের (CAG) অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি সংসদের কাছে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রধান প্রতিষ্ঠান। সিএজি (CAG) সরকারি দণ্ডের ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক (Financial), নিয়মিততা (Regularity) এবং পারফরমেন্স (Performance) অডিট পরিচালনা করে থাকে এবং অডিট প্রতিবেদন সংসদে দাখিল করে। সরকারি দণ্ডের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অডিটের এই ভূমিকাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। সিএজি তার অডিট প্রতিবেদনে সরকারি অর্থের অনিয়মিত ব্যয়, অপচয়, ছুরি, দুর্বীতি এবং ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন দণ্ডের এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে। তবে, সিএজি (CAG) প্রতিষ্ঠানের কার্য-ক্ষমতায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অডিটের উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং তার ক্ষেত্রে নির্ধারণ ছাড়াই খণ্ডিতভাবে অডিট পরিচালিত হয়। অডিট প্রতিবেদনগুলো প্রায়ই সময়মতো প্রস্তুত বা দাখিল করা হয় না, যার ফলে জবাবদিহিতার কাঠামোতে অডিটের গুরুত্ব হারিয়ে যায়।

ছ। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি’ (PAC) সিএজি (CAG) কর্তৃক সংসদের নিকট দাখিলকৃত বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন এবং অন্যান্য অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এবং শুনান্বিত জন্য সভার আয়োজন করে। এই সভায় মন্ত্রগুলয়ের সচিব বা মুখ্য হিসাব কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer, PAO) উপস্থিত থাকেন এবং সরকারি অর্থের অনিয়ম, অপচয় বা অপব্যবহারের জন্য জবাবদিহি করেন। তবে ‘পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি’ (PAC) বাস্তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে সিএজি (CAG) থেকে উচ্চমানের প্রতিবেদন না পাওয়া এবং অডিট প্রতিবেদনে সরকারি অর্থের অপচয় বা অপব্যবহারের উপর বিশ্বাসযোগ্য নিরীক্ষার ফলাফল (Audit Findings) না থাকা। এছাড়া, লজিস্টিকস ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতাও ‘পিএসি’ (PAC) এর কার্যক্ষমতাকে বাধাগ্রহণ করে।

জ। দুর্বীতি দমন কমিশনঃ ২০০৪ সালের দুর্বীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী দুর্বীতি দমন কমিশন বা ‘এসিসি’ (ACC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বাধীন সংস্থা, যা দুর্বীতি প্রতিরোধ এবং দুর্বীতির অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এবং বেসরকারি নাগরিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্বীতি দমন কমিশন বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্বীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনসেবায় উন্নতি সুপরিশের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। তবে এসিসি (ACC) প্রতিষ্ঠার পর হতে কখনোই স্বাধীনতাবে কাজ করতে পারে নাই। এটি ক্ষমতাসীন সরকারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দুর্বীতির অভিযোগে তদন্ত বা মামলা করার ক্ষেত্রে সংস্থাটি সরকার নিযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল। এসিসি (ACC) এর প্রধান এবং অন্যান্য শৈর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ ক্ষমতাসীন দলের আনুগত্যের ভিত্তিতে মনোনীত হয়েছেন।

ঝ। তথ্য কমিশন এবং স্বচ্ছতাঃ ২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা নাগরিকদের ‘তথ্যের অধিকার আইন’ (Right to Information Act - RTI Act) অনুযায়ী সরকারি তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কাজ করে। তবে তথ্যের অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পরেও কতিপয় আইন যেমন ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয়তা আইন (Official Secrets Act of 1923) পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। তথ্য কমিশন সরকারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে; কারন এর সদস্যরা ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে মনোনীত হতেন। সরকারি তথ্যের সরবরাহে আমলাতাত্ত্বিক বাধা এবং রাজনৈতিক মেত্তের স্বচ্ছতা সৃষ্টিতে অনগ্রহ এর অন্যতম কারণ। ২০১৮ সালের ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন’ (Digital Security Act- DSA) এবং এর উত্তরসূরি ২০২৩ সালের ‘সাইবার সিকিউরিটি আইন’ (Cyber Security Act- CSA) জন-প্রশাসনের স্বচ্ছতা আরও খর্ব করেছে।

ঝ। ন্যায়পাল (Ombudsman): বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন ন্যায়পাল (Ombudsman) নিয়োগের বিধান রয়েছে। ন্যায়পাল এর দণ্ডরটি জনসেবা প্রদানে বিলম্ব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের হয়রাণির অভিযোগ সমাধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হতে পারত। তবে, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও এই দণ্ডরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। প্রতিটি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও, ক্ষমতায় আসার পরে কোনো সরকারই এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়নি। ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার অভাবে সরকারি দণ্ডের জনসেবা না পাওয়া, জনসেবা প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং হয়রানির জন-অভিযোগের কোনো কার্যকর সমাধান হয়নি। যদি ন্যায়পালের প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে সরকারি দণ্ডের জনসেবা প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানির অভিযোগ অনেকটা হ্রাস পেত এবং সরকারি খাতে জবাবদিহিতাও শক্তিশালী হত। ন্যায়পালের দণ্ডের প্রতিষ্ঠা করা হলে জনসেবার মানোন্নয়ন হবে এবং সেবা প্রদানে বিলম্ব ও সরকারি কর্মকর্তাদের হয়রানি সংক্রান্ত জন-অভিযোগ সমাধানে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। ন্যায়পাল দ্রুততার সাথে অভিযোগকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত কর্মকর্তা বা দণ্ডের প্রধানের শুনান্বিত আয়োজন করতে পারবে এবং আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই দুই পক্ষের শুনান্বিত মাধ্যমে দ্রুত অভিযোগটি নিষ্পত্তি করতে পারবে, যা দুর্বীতি দমন কমিশন এর পক্ষে সম্ভব নয়।

ট। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED): পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ‘বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ’ (IMED) উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করে। প্রকল্পের আউটপুট (Output) এবং ফলাফল (Outcome) নিয়ে আইএমইডি (IMED) এর মূল্যায়ন সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হতে পারত। তবে ‘আইএমইডি’ (IMED) এর প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রমে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমনঃ

- (১) যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত করা,
- (২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন সময়মতো দাখিল বা প্রকাশিত না হওয়া,
- (৩) মূল্যায়নের সুপারিশগুলোর ওপর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর ইতিবাচক পদক্ষেপের অভাব, এবং
- (৪) সুপারিশ কার্যকর করার জন্য কোনো প্রয়োগিক ব্যবস্থা না থাকা,

পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক ক্যাডার বিলুপ্ত করে প্রশাসন ক্যাডারে একত্রিত করার কারণে প্রকল্প মূল্যায়নের মান আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

ঠ। জনপ্রশাসনের রাজনীতিকীকরণ এবং নিরপেক্ষতাঃ স্থায়ী সিভিল সার্ভিসের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য (Core Values) হলো সরকারি কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে যে, কোনো সরকারি কর্মকর্তা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবেন না। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে চরম রাজনীতিকীকরণ ঘটেছে। ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ররোচনের জন্য কর্মকর্তাদের ব্যবহার করেছে এবং কিছু কর্মকর্তাও ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন। কোনো সার্ভিস কল্যাণ সমিতি রাজনৈতিক দলের ব্যানারে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। এর ফলে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মেধার ব্যাপক অবমূল্যায়ন হয়েছে এবং জবাবদিহিতাও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ড। সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধিৎ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য একটি আধুনিক আচরণবিধি (Code of Conduct) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি ১৯৭৯ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, কারণ আধুনিক আচরণবিধির অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এতে অনুপস্থিত।

ঢ। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্ম-সম্পাদন পর্যবেক্ষণঃ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক বাজেট আলোচনার সময় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহের কৌশলগত ফলাফল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-সম্পাদন সূচকসমূহ (Key Performance Indicators) পর্যালোচনা করার কথা। তবে, প্রথাগত (Traditional) এবং ক্রমবর্ধমান (Incremental) বাজেট পদ্ধতি অনুসরণের কারণে এই পর্যবেক্ষণ কার্যকরভাবে করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে আর্থিক জবাবদিহিতাও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ণ। সামাজিক জবাবদিহিতা কৌশল (Tools) এবং সুশীল সমাজের ভূমিকাঃ সামাজিক জবাবদিহিতা এমন একটি পদ্ধতি যেখানে নাগরিক, কমিউনিটি, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করে। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি মনিটরিং, অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ণ, গণশুনানি, নাগরিক প্রতিবেদন কার্ড (Citizen Report Card, CRC) এবং কমিউনিটি স্কোর কার্ড (Community Score Card, CSC) ইত্যাদি। তবে, বাংলাদেশে এসব সামাজিক জবাবদিহিতার কৌশল কাঞ্চিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ এতে সরকারের সমর্থনের অভাব এবং সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর অভ্যরণীগ দুর্বলতা।

ত। সুপারিশমালাঃ জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কার

৮.১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (CAG) এর দণ্ডকে শক্তিশালীকরণঃ জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও নিরীক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে অডিটের পৃথকীকরণ এবং অডিটের গুণগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশ আগেও বিভিন্ন কমিশন করেছে। বর্তমান কমিশন একই সুপারিশ করেছে। নিরীক্ষা আইনে পারফরমেন্স অডিটিং-কে জোর দিতে হবে এবং আলোচ্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দণ্ডকে পাঠাতে হবে যাতে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৮.২	নিরীক্ষা আইনের অধীনে অডিট এন্ড একাউন্টেস ক্যাডার বিভাজনসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অডিট ও হিসাব বিভাগকে প্রশাসনিকভাবে এবং কর্ম-বিভাজনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ পৃথক করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি

৮.৩	পৃথকীকরণের পরে অডিট এবং হিসাব বিভাগের মধ্যে কোনো স্তরের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিয়োগ, আন্তঃবদলী এবং পদায়নের সুযোগ থাকবে না। বিভাজিত অডিট ও হিসাব বিভাগের ক্যাডার পদের বিভিন্ন স্তরে সমতা বিধানের লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির প্রয়োজন হতে পারে। সেই সঙ্গে নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির সকল স্তরের কর্মচারীদেরকে বর্তমানের পদসংখ্যা অনুযায়ী অডিট ও হিসাব বিভাগে স্থায়ীভাবে বিভাজন ও পদায়ন করা যেতে পারে। তবে পৃথকীকরণের পরে অডিট এবং হিসাব বিভাগের মধ্যে কোনো স্তরের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিয়োগ, বদলি এবং বিনিময়ের সুযোগ থাকবে না।	মধ্যমেয়াদি
৮.৪	প্রস্তাবিত নিরীক্ষা আইনে প্রতি বছর নির্দিষ্ট মাসে নিরীক্ষা ও নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন দাখিলের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৫	উক্ত আইনে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বর্তমান দপ্তরকে সচিবালয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি অর্থ ব্যবহার করে বিধায় সেগুলোর নিরীক্ষা কার্য নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ার বিধান করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৭	অডিট ও হিসাব বিভাগ পৃথকীকরণের পরে সিজিএ, সিজিডিএফ এবং রেলওয়ে হিসাব বিভাগ অর্থ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত থাকবে। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক (সিজিএ) অর্থ বিভাগের পক্ষে সিভিল, প্রতিরক্ষা এবং রেলওয়ে বিভাগের হিসাব সমন্বয় করে জাতীয় আর্থিক হিসাব প্রণয়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।	মধ্যমেয়াদি
৮.৮	ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (FIMA) অডিটর জেনারেলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তবে ফিমাতে হিসাব এবং অডিট বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বর্তমানের ন্যায় চলতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৮.৯	জনপ্রশাসনে জবাবদিহি ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি’সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান হিসেবে বিবেচ্য দলের সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান সংবিধান বা সংসদের ‘রুলস্ অব প্রসিডিউরস’-এ সংযুক্ত করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
৮.১০	সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটিগুলোর বিভিন্ন লজিস্টিকাল সুবিধাসমূহ যেমন- অফিস একেমোডেশন, যানবাহন, গবেষণা কর্মকর্তা এবং সাপোর্ট স্টাফ ইত্যাদির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
৮.১১	বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সংসদে প্রতিবেদন পেশঃ সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এর ১৫ (৮) ধারা অনুসারে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সরকারি আয় ও ব্যয়ের গতিধারা পরিবীক্ষণ করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে তা উপস্থাপন করার বিধান রয়েছে। কিন্তু আর্থিক জবাবদিহিতার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের বাধ্যবাধকতা দীর্ঘদিন যাবত উপেক্ষিত হয়ে চলছে। সুতরাং, কমিশন এ মর্মে সুপারিশ করছে যে, অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারি আয়-ব্যয়ের গতিধারা যথব্যথভাবে পরিবীক্ষণ করে এ সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং বর্ণিত আইনের বিধান অনুসারে তা জাতীয় সংসদের নিকট উপস্থাপন করবে।	মধ্যমেয়াদি
৮.১২	ইনসিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্সকে শক্তিশালীকরণঃ অডিট ও হিসাব বিভাগের বাইরে দীর্ঘদিন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের বিশাল সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য কোনো একাডেমি চিল্ড না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে অর্থ বিভাগের অধীনে ‘ইনসিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স (আইপএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ইনসিটিউটকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এর একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস এবং স্থায়ী ও উপযোগী ফ্যাকাল্টি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি

৮.১৩	<p>কর্মসম্পাদন বা পারফরমেন্স বাজেট ব্যবস্থা প্রবর্তনং বাজেট আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদন সূচক কার্যকরভাবে আলোচনা করা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং সরকারি অর্থ ব্যয়ে অর্জিত সাফল্য নিরূপনে প্রথাগত বা ক্রমবর্ধমান বাজেট ব্যবস্থা হতে পর্যায়ক্রমে কর্মসম্পাদন বা পারফরমেন্স বাজেট ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য অর্থ বিভাগকে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করা হলো।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.১৪	<p>দূর্নীতি দমন কমিশন (ACC)- কে শক্তিশালীকরণঃ দূর্নীতি দমন কমিশনকে স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে, যাতে তারা নিজেদের বিধিবিধান প্রণয়ন করতে পারে। প্রত্যেক ভরের কর্মকর্তা নিয়োগে দূর্নীতি দমন কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.১৫	<p>বাংলাদেশ তথ্য কমিশনকে শক্তিশালীকরণঃ বাংলাদেশ তথ্য কমিশনকে অধিকতর কার্যকর একটি সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এর চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে করা যেতে পারে। তথ্য কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে কর্মরত একজন বিচারকের নেতৃত্বে একজন করে তথ্য অধিকার সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি তথ্য কমিশনের প্রধান ও সদস্য নিয়োগের সুপারিশ করবে। কমিশন চেয়ারম্যান ও সদস্যরা এক মেয়াদির বেশি এ পদে থাকতে পারবেন না। কমিশনের শাখা অফিস প্রশাসনিক বিভাগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। নাগরিকরা চাহিদামত সহজেই তথ্য না পেলে যেন বিভাগীয় তথ্য কমিশনার বরাবরে আপিল করতে পারে সে বিধান করার জন্য সুপারিশ করা হলো। বিভাগীয় তথ্য কমিশনার আপিলের উপর দ্রুত সিদ্ধান্ত দিবেন। এছাড়া তিনি জেলা ও উপজেলা সফর করে তথ্য কমিশন ও সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করবেন।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.১৬	<p>ন্যায়পাল (Ombudsman) এর দণ্ডের প্রতিষ্ঠাসুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক বা সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জনপ্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য কোনো নির্দলীয় ব্যক্তিকে ন্যায়পাল নিয়োগ করা যেতে পারে। সংবিধানের ৭৭ ধারা অনুসূরে দেশের জন্য একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করা যেতে পারে। ১৯৮০ সালের ন্যায়পাল আইন সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে রাষ্ট্রপতির কর্তৃক ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করা হলো। ন্যায়পাল প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের স্পীকারের নিকট দাখিল করবেন। একজন ন্যায়পাল তিন বছরের বেশি উচ্চ পদে থাকবেন না।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.১৭	<p>অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাঃ (Grievance Redress System- GRS): ন্যায়পাল (Ombudsman) দণ্ডের প্রতিষ্ঠার পরে মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারি দণ্ডের অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ বা প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যায়পালের দণ্ডের ন্যস্ত হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.১৮	<p>সরকারি অফিসগুলিতে নতুন কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Performance Management) ব্যবস্থা চালুকরণঃ</p> <p>(ক) সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ সাংগঠনিক চার্টার' (Organization Charter) বা সংগঠনের কার্যাবলিতে এবং 'টেবেল অব অরগানাইজেশন এন্ড ইকুইপমেন্ট' (Table of Organization and Equipment- TO&E) -এ তাদের ভিশন ও মিশন সংজ্ঞায়িত থাকবে।</p> <p>(খ) সকল সরকারি দণ্ডের ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদের, পদমর্যাদা ও স্তর নির্বিশেষে, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কাজের বিবরণ (Job Description) প্রস্তুত করতে হবে এবং লিপিবদ্ধ থাকবে।</p> <p>(গ) প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দণ্ডের কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি

৮.১৯	<p>সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (Performance Evaluation) পদ্ধতি চালু করাঃ বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR)-এর পরিবর্তে নতুন বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (Annual Performance Evaluation- APE) পদ্ধতি চালু করতে হবে। বছরের শুরুতে প্রত্যেক কর্মকর্তা বার্ষিক কাজের পরিকল্পনা (Annual Work Plan- AWP) নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট জমা দেবেন। বছরের শেষে সিনিয়র কর্মকর্তারা সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (Performance Evaluation) করবেন। এরপ মূল্যায়ন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা (Performance) চারটি বিভাগে মূল্যায়ন করা যেতে পারেং অস্তোষজনক, সন্তোষজনক, ভালো এবং চমৎকার। কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আর্থিক সুবিধা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। একইভাবে, প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে বাজেট বৃদ্ধি বা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.২০	<p>সরকারি দণ্ডের/ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কাজের পরিকল্পনা ও কর্ম-দক্ষতা মূল্যায়ন (Performance Review-PR): প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান বার্ষিক কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন এবং বছরের শুরুতে এটি উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন। প্রতিষ্ঠানের কর্ম-দক্ষতা মূল্যায়ন অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। বর্তমান বার্ষিক কর্ম-দক্ষতা চুক্তি (APA) ব্যবস্থা বজায় রাখা যেতে পারে; তবে এটি আরও কার্যকর করার জন্য তিন বছর অন্তর মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে বাজেট বৃদ্ধি বা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.২১	<p>মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ : প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দণ্ডেরকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি বছর তার কর্মসম্পাদনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। একই প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংস্থার ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে। এ প্রতিবেদনে আইন ও বিধি-বিধান, আর্থিক বিবরণী, পরিবেশ দৃষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি স্থান পেতে পারে। এ প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী বছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, অর্জিত সাফল্য, আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং বিশেষ অর্জনসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.২২	<p>উন্নত তথ্য নীতিঃ বাংলাদেশ সরকার এরপ উন্নত তথ্য নীতি গ্রহণের কথা বিবেচনা করতে পারে, কারণ সরকারি তথ্য উন্নত করলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতি লাঘবে সহায়ক হবে। তথ্য অধিকার আইন সংশোধন প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্যের অবাধপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য The Official Secrets Act 1923 এবং The Evidence Act 1872 প্রয়োজনীয় সংশোধন করে যুগোপযোগী করা যেতে পারে। সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ার নিরপেক্ষ, সত্যাষ্টী, বন্ধনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সংবাদ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদিদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য উত্থাপন দিতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৮.২৩	<p>‘প্রশাসনিক ন্যায়পাল’ নিয়োগ ও তার সচিবালয় প্রতিষ্ঠাঃ জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কোনো কোনো সময়ে অযাচিত ও অনাকাঙ্খিতভাবে হেনস্টার শিকার হন। এরপ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য না শনেই কর্মসূল থেকে প্রত্যাহার বা ওএসডি করা হয়। অনেক সময় সরকারি কাজ করতে গিয়ে কর্মকর্তারা মামলায় জড়িয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থার তাদেরকেই বহন করতে হয়। অনেকে অবসরে যাওয়ার পরও আইনী লড়াই এবং মামলার খরচ দিতে হিমসিম থান। এরপ পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুততর সময়ের মধ্যে একজন ‘প্রশাসনিক ন্যায়পাল’ নিয়োগ করা যেতে পারে। জাতীয় সংসদে আইন পাসের জন্য অপেক্ষা না করে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করে প্রশাসনিক ন্যায়পাল নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তিনি সরকারি কর্মচারীদের শুনানী গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠাবেন।</p>	মধ্যমেয়াদি

৮.২৪	জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কারণ	
ক)	সকল সরকারি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের বার্ষিক বাজেট নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য ও উম্মুক্ত থাকতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও ন্যায্য নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	সরকারি পরিষেবায় নাগরিক সমাজ সন্তুষ্ট কিনা বা তাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা তা জানার জন্য নিয়মিতভাবে গণশুনানি করতে হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একই সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
ঘ)	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার একটি প্রশাসনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং তাকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিধি মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি বছর তার সম্পদের ঠিসাব বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। পেশকৃত সম্পদ বিবরণী জনগণের দেখার জন্য উম্মুক্ত রাখা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
ঙ)	অনেতিক, অন্যায় ও দুর্বীন্তি উদ্ঘাটনে তথ্যপ্রকাশকারী (whistleblower) কাজকে উৎসাহিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ২০১১ সালে প্রণীত তথ্যপ্রকাশ (সুরক্ষা) আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ আইনের মাধ্যমে তথ্যপ্রকাশকারীকে সকল ধরনের হয়রানি থেকে তাদের সুরক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনটি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
চ)	প্রশাসনিক ট্রাইবুনালকে জনবল ও লজিস্টিক দিয়ে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।	
ছ)	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য আইনজীবি নিয়োগের মাধ্যমে দু'টি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা যেতে পারে। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি
জ)	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপনঃ বর্তমানে ভূমি সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। নাগরিকদের ভোগান্তি দূরীকরণের জন্য প্রতি বিভাগে একটি করে স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় নং

জনপ্রশাসনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য সংস্কার

ক। নিরপেক্ষ জনপ্রশাসন কেন? নিরপেক্ষ জনপ্রশাসন বলতে কোনো রাজনৈতিক দল, সংগঠন, সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণ পক্ষপাতাইনভাবে নাগরিক সেবা প্রদানকে বুৰায়। সরকারি কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত পছন্দ বা পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে সর্বপক্ষকার চাপমুক্ত অবস্থায় নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন করবেন এবং কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দলের প্রতি অনুগত না হয়ে দেশের সংবিধান ও আইনের শাসনের প্রতি অনুগত থাকবেন এটাই একটি গণতান্ত্রিক দেশে কাম্য। নিরপেক্ষ জনপ্রশাসন শুধুমাত্র জনগণের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশাই নয়; বরং এটি পাওয়া জনগণের একটি অধিকার। জনপ্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়, দুর্বীতির বিস্তার ঘটে, সমাজে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং নাগরিক অধিকার সংরূচিত হয়। জনগণ স্থায়ী, কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল, জনপ্রশাসনকে গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্বাচিত সকল সরকারের অধীনে আস্থাভাজন হয়ে জনসেবা প্রদান করতে হয়। এ জন্য জনপ্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

খ। নিরপেক্ষ সিভিল সার্ভিস বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৩৬ মোতাবেক দেশে একটি মেধাভিত্তিক, স্থায়ী, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারীর আচরণ বিধিতে সরকারি কর্মচারীদের নৈতিক মান সমূলত রাখার জন্য বাধ্যতামূলক বিধান রয়েছে। বর্তমান বিশে সিভিল সার্ভিসের নিরপেক্ষতা সুষ্ঠু জনপ্রশাসনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ। জনপ্রশাসনে দলীয়করণের কৌশলঃ আমাদের দেশে বিগত সময়ে জনপ্রশাসনে দুঁটো ক্ষেত্রে দলীয়করণের অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। প্রথমত জনপ্রশাসনে দলীয় লোকজনকে নিয়োগ দান, কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে দলীয় মতাদর্শের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদান করে নিরপেক্ষ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বাস্তিত করে ক্রমান্বয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও.এস.ডি) করে বসিয়ে রাখা এবং অপছন্দের কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে তাদের সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিগণ কর্তৃক হস্তক্ষেপ এবং তাদের নির্দেশিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মকর্তাদের বাধ্য করা।

বিগত বছরগুলোতে জনপ্রশাসনে দলীয় লোকদের নিয়োগ ও দলীয় কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদান, সরকারি কর্মকাণ্ডে প্রায় সকল আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং আইনানুগ সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত প্রদান প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ফলে দেশে আইনের শাসন ভূলুঞ্চিত হয়, দুর্বীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়, বিচার ব্যবস্থা স্বাধীনতা হারায়, জুলুম, নির্যাতন বেড়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক শাসনের স্থলে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে বিভিন্ন সময়ে সরকার তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ব্যবহার করেছে; এমনকি জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ করে এর পেশাদারি চরিত্র নষ্ট করেছে। জনপ্রশাসনের মান ও ভারসাম্য এখন এক ক্রান্তিকালে উপনীত হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা ও অধিকার ন্যায্যভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জনমুখী, জবাবদিহীনমূলক, নিরপেক্ষ ও দক্ষ সিভিল প্রশাসন গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

ঘ। নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনঃ বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত নিয়োগের পূর্বে পুলিশের বিভাগের কাছে গোপনীয় প্রতিবেদন চাওয়া হয়। আবার উচ্চতর পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগের কাছে রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চাওয়া হয়। কারণ জনপ্রশাসনে রাজনীতিকীকরণ এ স্তর থেকেই গুরু হয়। কমিশন মনে করে, এ নিয়ম বাতিল হওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে, পাসপোর্ট পাওয়া একজন ব্যক্তির নাগরিক অধিকার। সেক্ষেত্রেও পুলিশের গোপন প্রতিবেদন চাওয়ার রেওয়াজ আছে। কমিশন মনে করে, একজন নাগরিককে তার জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে পাসপোর্ট দেওয়া উচিত। তাহলে নাগরিকদের হয়রানি ও দূর্বীতি করে যাবে।

ঙ। দলীয়করণের ক্ষেত্র ও প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ উল্লিখিত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয়করণের দৃষ্টান্ত ঘটে থাকেঃ (১) সরকার দলীয় ও অনুগত লোকদের নিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন; (২) সরকার দলীয় যুব, ছাত্র ইত্যাদি অঙ্গ সংগঠনভুক্ত প্রাচীন ও উজনদের অন্যায্যভাবে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ; (৩) জনপ্রশাসনে দলীয় স্বার্থ বিবেচনায় বদলি ও পদোন্নতি প্রদান; (৪) দলনিরপেক্ষ, সৎ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বাস্তিত করা বা ওএসডি করে বিলা কাজে বসিয়ে রাখা, এবং (৫) অপছন্দ কর্মকর্তাদের ২৫ বছর পূর্তির পর বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো ইত্যাদি। বর্ণিত অবস্থায় জনপ্রশাসনকে দলনিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা যায়ঃ (১) জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ, (২) সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়মবহির্ভূত হস্তক্ষেপ ও (৩) দূর্বীতি (উজনপ্রীতিসহ)

চ। সুপারিশমালাঃ জনপ্রশাসনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংস্কার

৯.১	<p>স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনঃ অতীতে বিভিন্ন সরকারের সময়ে যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ভোট জালিয়াতি, অর্থ-পাচার, দূর্বীতি, এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণহত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে জনপ্রশাসনের পেশাদারিত্ব, ভাবমূর্তি ও একটি গণতান্ত্রিক দেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্তের জন্য মাঠ পর্যায়ে জনমত রয়েছে বিধায় একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বলে কমিশন মনে করে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.২	<p>পুলিশ ভেরিফিকেশনঃ পদোন্নতির ক্ষেত্রে পুলিশ বা কোনো গোয়েন্দা বিভাগের কাছে রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চাওয়ার প্রথা বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। কারণ জনপ্রশাসনে রাজনীতিকীকরণ এ ক্ষেত্রে থেকেই শুরু হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পূর্বে কোনো প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন করা যাবে না। বিসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত নিয়োগের পূর্বে পুলিশের বিভাগের কাছে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রতিবেদন চাইবে। প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দূর্বীতি দমন কমিশনে প্রতিবেদন চাইতে পারে। পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিবর্তে প্রার্থীর যোগদানকৃত মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। এ ছাড়া পাসপোর্ট, দৈত নাগরিকত্ব, সমাজসেবা সংস্থা বা এনজিও-র বোর্ড গঠন ইত্যাদি নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম বাতিল করার জন্যও সুপারিশ করা হলো। একজন নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র থাকলে তার বিষয় নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.৩	<p>১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরহস্থণঃ সিভিল সার্ভিস এ্যান্ট, ২০১৮-এর ৪৫ ধারা সংশোধনক্রমে কোনো সরকারি কর্মচারীর ২৫ বছর চাকুরিকাল পূর্তিতে তাকে সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের বিধান বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। তবে বিধান রাখা যায় যে, কোনো সরকারি কর্মচারী ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে অবসর নিতে আবেদন করলে সরকার তা মঙ্গল করতে পারবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.৪	<p>রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণঃ কোনো সরকারি কর্মকর্তা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে আয়োজিত কোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে। বিশেষ করে বিভিন্ন সার্ভিসের নামে যে সকল সমিতি রয়েছে তারা কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতার পরিচয় দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বা দাবি আদায়ের জন্য কোনো বিক্ষেপ বা প্রতিবাদ সমাবেশ করতে পারবেন না। ব্যক্তি হিসেব কেউ সংশ্লিষ্ট বা বৈষম্যের শিকার হলে তার প্রতিকারের জন্য তিনি বিধি মোতাবেক আবেদন করতে পারবেন।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.৫	<p>সরকারি কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানঃ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরপেক্ষভাবে ও সততার সাথে আইনানুগ দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের চাকুরির, সামাজিক র্যাদা, আর্থিক ও জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং তাদেরকে সকল ধরনের হয়রানি হতে রক্ষা করতে হবে। এ জন্য The Civil Service Act 2018 -তে সরকারি কর্মচারীদের নিরাপত্তা প্রদানের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.৬	<p>মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পাদয়নঃ অতীতে দেখা গেছে যে, সিভিল সার্ভিসের অনেক অফিসার মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণে পরবর্তী সরকারের আমলে হয়রানির শিকার বা পদোন্নতি বর্ষিত বা ওএসডি হয়েছেন। এরপ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি

৯.৭	<p>Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়নঃ সরকারি কার্যনির্বাহে বহু বিষয়ে জনপ্রশাসনকে আইন, বিধি ও নীতিমালা মোতাবেক প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রায়শ অনেতিক বা আইন ও বিধি বহির্ভূত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এ সকল হস্তক্ষেপের ফলে ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়, জনস্বার্থ উপক্ষিত হয়, প্রশাসনের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিষ্ণু ঘটে এবং জনপ্রশাসনের প্রতি জনমানুষের আঙ্গুলীয়ন সৃষ্টি হয়। এ জন্য সরকারি কার্যনির্বাহে জনপ্রতিনিধিগণের সিদ্ধান্ত প্রদান বা হস্তক্ষেপের একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করতে হবে। এ জন্য প্রতি মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধির মধ্যে Rules of Business ও Standard Operating Procedure অনুসারে কর্মবন্টগ করে দিতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.৮	<p>নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নঃ সরকারি কর্মকর্তারা বিদ্যমান বিধিবিধানের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মসম্পাদন, মনিটরিং এবং সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। অপরদিকে, জনপ্রতিনিধিগণ কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা অন্য কোনো সংস্থার কাজে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে কিনা এবং জনগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট কীনা তা সংসদীয় হায়ী কমিটির মাধ্যমে যাচাই করে সঠিক কর্মপদ্ধা ও প্রয়োজনে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.৯	<p>জনপ্রতিনিধির কর্মপরিধিঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিগণ কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক কর্ম পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবেন না। কোনো মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক ব্যক্তি কোনো সরকারি কর্মচারীকে অন্যায় ও বিধি-বহির্ভূত কাজের জন্য অনেতিক চাপ প্রয়োগ করলে তিনি বিষয়টি গোপনীয়ভাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অবহিত করবেন বলে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। কোনো বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উপরন্তু কর্মকর্তা বা উপরন্তু জনপ্রতিনিধি ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই তাকে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করতে হবে। মৌখিক নির্দেশ বাস্তবায়ন করা যাবে না এবং মৌখিক নির্দেশ তা কার্যকর করা যাবে না।</p>	মধ্যমেয়াদি
৯.১০	<p>জনপ্রশাসনে দুর্নীতিরোধে সুপারিশঃ</p>	
ক)	<p>সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং সকল সংসদ সদস্যকে প্রতি বছর সম্পদ বিবরণী সংশ্লিষ্ট বিভাগে পেশ করতে হবে। উক্ত সম্পদ বিবরণী অনলাইনে জনগণের প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
খ)	<p>জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা (National Integrity System-NIS): বিদ্যমান জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
গ)	<p>কর্মকর্তাদের কর্মএলাকাণ্ড স্বজনপ্রীতি রোধের জন্য কর্মকর্তাদের নিজ প্রশাসনিক বিভাগে চাকুরি করার বিধান রাখিত করা এবং দুর্নীতির সুযোগ প্রতিরোধের জন্য কোনো কর্মকর্তাকে একই স্টেশনে তিনি বছরের অধিক না রাখার বিধানকে কর্তৃতোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় দশ

জনপ্রশাসনে দক্ষত বিকাশ ও সক্ষমতার উন্নয়ন

ক। আমলাদের দক্ষতার অভাবঃ বাংলাদেশে সরকারি খাতে দক্ষতা অর্জনের অনেক চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রগালয় ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সমব্যয়ের অভাব বেশ প্রকটভাবেই দেখা যায়। মন্ত্রগালয় ও বিভাগগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধীরগতিতে কাজ করে, যার ফলে বহুক্ষেত্রে নীতির বাস্তবায়নে সঠিকভাবে হয় না। কর্মকর্তাদের মধ্যে একদিকে সাধারণ দক্ষতার অভাব; অপরদিকে সীমিত প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে জটিল নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তাদের নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। সর্বোপরি আমলাদের কার্যকারিতা প্রভাবিত হওয়ায় জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ অগ্রহ্য করা হয়।

খ। প্রক্রিয়াগত জটিলতাঃ সঠিক কর্মজীবন পরিকল্পনা ক্ষেত্রেকে ঘন ঘন বদলি কর্মকর্তাদের কাজের ধারাবাহিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি জৰাবদিহিতা হ্রাস পায়। আবার মাঝ পর্যায়ের মতামত গ্রহণ ক্ষেত্রেকে নীতি নির্ধারণ বা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকালে প্রতিরোধের সম্মুখিন হয়। এছাড়া অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও দীর্ঘ অনুমোদন প্রক্রিয়া কর্মসম্পাদনের গতিকে শুধু করে দেয়।

গ। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধাঃ অপর্যাপ্ত সম্পদ বরাদের কারণে নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং সম্পদের প্রাপ্তিতার মধ্যে অসম সমব্যয়ের কারণে বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হয়। দুর্বল তদারকি ও মূল্যায়ন কাঠামোর কারণে সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও সমাধান করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া দুর্বল ও অদক্ষতা সম্পদের অপব্যবহার প্রকল্পের গুণগত মান ও ফলাফলকে অবমূল্যায়ন করে। অধিকন্তু নীতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে সংযোগের অভাব থাকে অর্ধাই উচ্চাভিলাষী নীতিগুলোতে প্রায়ই কার্যকর রোডম্যাপের অভাব থাকে, যা বাস্তবায়নকে বাঁধা দেয়।

ঘ। জ্ঞান ও দক্ষতার কার্যকর সমষ্টিঃ করার জনপ্রশাসনের মধ্যে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হলো ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপরিহার্যতা এবং প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ জ্ঞান ও দক্ষতাকে সমন্বিত করার প্রয়োজনীয়তা। প্রশাসনিক উন্নয়নের প্রায় সকল সুনির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্ক বিবেচনা করার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব কী তা জিজ্ঞাসা করা সহায়ক বলে মনে করা হয়। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গড়ে তোলার পরিবর্তে জ্ঞানের সর্বাধিক ব্যবহার করার প্রয়োজন। ক্ষমতার গুরুত্বের প্রতি সংবেদনশীলতা দেশের লক্ষ্য ও পেশাদারিত্বের প্রতিযোগিতাকে উপেক্ষা করে। বস্তুত এটি অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এ কারণে, জনপ্রশাসনে প্রকৃত অনুশীলন সম্পর্কে আরও জ্ঞান প্রয়োজন। দেশের শুশাসন ও যুগোপযোগী উন্নয়নের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে একটি কার্যকর আমলাতত্ত্ব প্রয়োজন। এটি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাছাই, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন, স্থানান্তর, কর্মজীবনের অগ্রগতি/পরিকল্পনা এবং পদোন্নতি হতে হবে সম্পূর্ণ মেধাবিত্তিক।

ঙ। দক্ষতা উন্নয়নের কাঠামোঃ কার্যকরী জনসেবা প্রদানের পূর্ব শর্ত হচ্ছে একটি দক্ষতাভিত্তিক কাঠামো। প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সমষ্টিয়ে জনপ্রশাসকদের (Public Administrator) কার্যক্রমকে শ্রেণিবিন্যাস করার ক্ষেত্রে যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামো উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা জরুরি। এ দক্ষতা কাঠামোটি প্রতিষ্ঠাতার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য মাপকাঠি থাকা উচিত এবং প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, বদলি, কর্মজীবনের অগ্রগতি/পরিকল্পনা, পদোন্নতি ও ছাঁটাই/অবসরের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলোকে এর আওতায় আনা উচিত। জনপ্রশাসনের প্রতিটি পদের অবশ্যই একটি দক্ষতাভিত্তিক কাঠামো থাকতে হবে যাতে কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তা পেশাগতভাবে অগ্রিম দায়িত্ব ও কাজ সম্পাদন করতে পারে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিদ্যমান কাঠামোর ঘাটতিসমূহ বিবেচনা করা উচিত এবং ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তাদের প্রস্তুত করা উচিত। এটি কর্মকর্তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করবে।

চ। প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নঃ প্রশিক্ষণ সরকারি কর্মচারীদের অত্যাবশ্যক বিষয়ে আপডেট করে এবং ধারাবাহিকভাবে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে তীক্ষ্ণ করে ফলে তারা দক্ষতার ও ফলপ্রসূভাবে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। দক্ষতা কাঠামোর উন্নয়ন ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা উচিত। অন্যথায় প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা সীমিত হয়ে যায়। নেতৃত্বের দক্ষতা, কৌশলগত চিত্তা, অন্যান্যদের সাথে সমষ্টিয়ে করে জনসেবা প্রদান, উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলা করা, সমস্যা সমাধানের জন্য সমালোচনামূলক চিত্তা করাসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত।

ছ। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংক্ষারঃ বাংলাদেশে জনপ্রশাসনের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আচরণে গুণগত পরিবর্তনের জন্য বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় যথাযথ সংক্ষার করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে BPATC, BCS Administration Academy, BARD, BIGM সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্ম প্রক্রিয়ায়, কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে দীর্ঘাদিন থেকেই অনেক সমস্যা বিরাজ করছে। বিশেষ করে এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের স্বায়ত্ত্বাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা, কর্মরত জনশক্তির ক্ষয়িরিয়ার প্লানিং, দক্ষতা উন্নয়ন ও জৰাবদিহিত নিশ্চিত করা দরকার। এ লক্ষ্যে উন্নিখিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন সংক্ষার কমিশন সুপারিশ করছে।

জ। সুপারিশমালাঃ জনপ্রশাসনে নেপুণ্য বিকাশ ও সক্ষমতার উন্নয়ন

১০.১	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতাঃ সরকারের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও প্রশিক্ষণে উৎকর্ষতা আনার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্বাধীন প্রশিক্ষণ কমিশন গঠন করার জন্য সুপারিশ করা হলো। এ কমিশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্ত্বশাসন নিশ্চিত করবে, কর্মচারীগত সংস্কার, কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিবে।	মধ্যমেয়াদি
১০.২	প্রশিক্ষণের চাহিদা নির্ধারণ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের চাহিদা নির্ধারণ (TNA) এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণের সুফল নির্ণয় ও উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নির্বাচন করা যায়। TNA সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতার অভাবের কারণ চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।	মধ্যমেয়াদি
১০.৩	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণঃ বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে (BPATC) সকল বেসামরিক কর্মচারীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সেন্টার অফ এক্রেলেস হিসেবে গড়ে তোলা উচিত যাতে সকল সার্ভিসের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের অভিন্ন ও যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যায় এবং বৈম্য ভ্রাস পায়। তবে বিপিএটিসি, সাভার-এর পক্ষে সকল সার্ভিসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ একসঙ্গে করা সম্ভব নয়; তাই গোপালগঞ্জ, জামালপুর ও রংপুরে অবস্থিত অব্যবহৃত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একই সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আঞ্চলিক বিপিএটিসি হিসেবে ঘোষণা করে একই মডিউলে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য সুপারিশ করা হলো। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সিলেবাস পর্যালোচনা করে যুগপোয়েগী করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১০.৪	প্রশিক্ষণ একাডেমিয়ার সাথে সহযোগিতাঃ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ একাডেমিয়ার সাথে শক্তিশালী সহযোগিতার কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সম্পদের সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত করা উচিত।	মধ্যমেয়াদি
১০.৫	উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের কার্যক্রমঃ বিশ্বব্যাপী স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি একটি কৌশলগত ব্যবস্থাপনা দ্বারা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যাদের ফ্যাকাল্টি সদস্যগণ বিদেশি ডিগ্রিধারী তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মাস্টার্স প্রোগ্রামের মতো উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে। সরকার এরূপ প্রোগ্রামগুলোর জন্য বৃত্তি প্রদান করতে পারে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সার্ভিসের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় বৃদ্ধি করতে পারে। প্রোগ্রামগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সর্তকর্তার সাথে পরিকল্পিত বিদেশ সফর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা বেসামরিক কর্মচারীদের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং যা ব্যয়ে সাশ্রয় হবে।	মধ্যমেয়াদি
১০.৬	উচ্চতর প্রশিক্ষণঃ BPATC-এর বিদ্যমান তিনটি মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যথা Foundation Training Course (FTC), Advance Course on Administration & Development (ACAD), Senior Staff Course (SSC), Policy Planning and Management Course (PPMC)-এর পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের পৃথক TNA -এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদির উপরও নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১০.৭	প্রশিক্ষণের সাফল্য বিবেচনাঃ বর্তমানে বদলি, পদোন্নতি ও কর্মজীবন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সাফল্যকে বিবেচনায় নেয়া হয় না। এর ফলে কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে অংশীয় হন না এবং এমনকি তারা যখন যোগদান করেন তখনও এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া না। কর্মজীবনের সাথে প্রশিক্ষণকে সম্পৃক্ত করা হলে এরূপ মনোভাবের পরিবর্তন হবে। এভাবে প্রশিক্ষণে অর্জিত সাফল্যের তথ্য সরকারি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণ করা উচিত এবং সরকারি চাকুরিতে পেশাদারিত্ব আনার জন্য এসব বিবেচনায় নেয়া উচিত।	মধ্য মেয়াদি
১০.৮	অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রশিক্ষণঃ বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরি পরিমেবায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাদের জন্য নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া উচিত যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে তারা প্রশাসনিক কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষঃ ১) বেসিক ডিজিটাল জ্ঞান ও আইটি দক্ষতা; ২) ই-গভর্নান্স সিস্টেম ও পোর্টাল; ৩) ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল রেকর্ড কিপিং; ৪) সাইবার সিকিউরিটি সচেতনতা; ৫) কমিউনিকেশন ও কোলাবোরেশন টুলস ব্যবহার; ৬) নাগরিক কেন্দ্রিক সেবা প্রদান	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় এগারো

কর্মকুশল জনপ্রশাসনের জন্য সংস্কার

ক। কর্মদক্ষ জনপ্রশাসনের প্রয়োজনীয়তাঃ অদক্ষতা, কর্মক্ষমতার সমস্যা এবং ধীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যকর শাসন ব্যবস্থার অঙ্গরায়। একটি দক্ষ জনপ্রশাসন সর্বদা সম্পদের ন্যূনতম ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন (আউটপুট) নিশ্চিত করে। এতে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ জনপ্রশাসনের কর্মচারীরা কার্যকর প্রক্রিয়া ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের ন্যূনতম ব্যবহার করে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করে। এর মাধ্যমে সরকারের লক্ষণগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও নাগরিকদের চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়।

খ। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারঃ দেখা গেছে যে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে জনসেবায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক বাধাগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব; যেমন যোগাযোগ, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং সেবা প্রদানের জন্য শক্তিশালী ডিজিটাল সিস্টেম। প্রকৃতপক্ষে, রুটিন কাজগুলোর ডিজিটালাইজেশন/অটোমেশন সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের আরও জটিল এবং মান সংযোজনকারী কার্যকলাপে মনোনিবেশ করতে সক্ষম করে। এর ফলে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং নাগরিকদের চাহিদাগুলোর প্রতি আরও ক্রিয়াশীল হওয়া যায়।

গ। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশঃ সরকারি সংস্থা দ্বারা প্রদেয় সমস্ত সেবা সংজ্ঞায়িত এবং কিছুটা পরিমাণগত হতে হবে। একটি সেবা প্রদানের জন্য একটি সময়সীমা অনুসূরণ করতে হবে, যা সরকারের বিদ্যমান নাগরিক চার্টারে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত। বিলম্ব বা প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে, সেবা গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে (পূর্বনির্ধারিত) অবহিত করা আবশ্যিক। সঠিক সেবা প্রদানের নজরদারি করতে, সরকারি সংস্থাগুলোর একটি অভ্যন্তরীণ কর্মদক্ষতা নিরীক্ষা দল থাকা উচিত যা স্বাধীনভাবে সেবা প্রদানের দক্ষতা বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে এবং ক্রটি নির্গয়ের সাথে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে জমা দিতে হবে।

ঘ। বেসরকারি খাত ও অলাভজনক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতাঃ যেহেতু বেশিরভাগ সরকারি সংস্থা পৃথকভাবে কাজ করে, সেহেতু বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও অলাভজনক সংস্থাগুলোর মধ্যেও সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। এর ফলে, বিভিন্ন উদ্যোগের পুনরাবৃত্তি এড়ানো যেতে পারে এবং সহযোগিতামূলক প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব, যা সামগ্রিক কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করবে।

ঙ। উন্নতির সংস্কৃতি নিশ্চিত করাঃ ধারাবাহিক উন্নতির সংস্কৃতি নিশ্চিত করা স্থায়ী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, সরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়মিত তাদের প্রক্রিয়াগুলো পর্যালোচনা এবং পরিমার্জন করা উচিত যাতে প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কর্ম উন্নয়ন দল (WIT) গঠন করা যেতে পারে, যা কর্মচারী এবং অংশীদারদের থেকে নিয়মিত ফিল্ডব্যাক সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে এবং সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে। এর মধ্য দিয়ে উন্নাবন এবং পরিবর্তনের একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। এ ধরনের দল নতুন চর্চাগুলো চিহ্নিত এবং কার্যকর করতে পারবে এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোর কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

চ। সক্ষমতাভিত্তিক কাঠামো বিকাশঃ সরকারি সংস্থাগুলোতে দক্ষতার অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য একটি সক্ষমতাভিত্তিক কাঠামো বিকাশ এবং বাস্তবায়ন করা জরুরি। এরূপ সক্ষমতা কাঠামোটি নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ, পোস্টি, স্থানান্তর, কর্মজীবন উন্নতি/পরিকল্পনা, পদোন্নতি এবং এমনকি ছাঁটাই/অবসর ইত্যাদির প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত করে একটি অপরিহার্য মাপকাঠি হতে পারে। সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি পদে একটি সক্ষমতা কাঠামো থাকতে হবে যা ব্যক্তিগতভাবে কাজের দায়িত্বগুলো পেশাদারভাবে সাথে সম্পাদনের জন্য সহজ হবে। একটি সক্ষমতা কাঠামো কার্যকর সরকারি সেবা প্রদানের জন্য পূর্বশর্ত। নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলোর বিদ্যমান সক্ষমতা ঘাটাতি মোকাবেলা করা উচিত এবং কর্মকর্তাদের ভবিষ্যতের দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করা উচিত। এটি কর্মকর্তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনায় মানচিত্র তৈরিতেও সাহায্য করবে।

ছ। সেবা প্রদানের মান নির্ধারণ ও নাগরিকদের মতামত সংগ্রহ ব্যবস্থাঃ সেবা প্রদানের মান নির্ধারণ ও নাগরিকদের মতামত সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ডিজিটাল রূপান্তর ই-গভর্ন্যান্সের ঘাটতি পূরণ করতে পারে, আর প্রক্রিয়া সরলীকরণ প্রশাসনিক জটিলতা কমাতে পারে। কর্মক্ষমতা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়াবে, এবং আন্তঃসংস্থাপন সময় সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে। প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সম্পৃক্ততা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, যা সেবা গ্রহণ সহজ ও কার্যকর করবে।

জ। সুপারিশমালাঃ কর্মকুশল জনপ্রশাসনের জন্য সংস্কার

১১.১	উভয় সেবা প্রদানে দক্ষতাঃ	
(ক)	সেবা প্রদানের মান ও মানদণ্ড নির্ধারণগং প্রতিটি মন্ত্রণালয় নাগরিক সেবা প্রদানের একটি মান ও মানদণ্ড নির্ধারণ করবে। নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করে সেবার গুণগত মান উন্নত করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
(খ)	অন-লাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমঃ একটি অন-লাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন জনসেবার জন্য বিলবের পরিমাণ পরিমাপ করা যেতে পারে। একটি পরিষেবা সরবরাহের জন্য মোট গৃহীত সময়কে একজন কর্মচারীর কর্মদক্ষতার সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
(গ)	সিটিজেন চার্টারের জনসাধারণের প্রতি সেবা প্রতিশ্রূতি নির্ধারণ করে একটি সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। পাবলিক অফিস/মন্ত্রণালয় দ্বারা সরবরাহযোগ্য সমস্ত পরিষেবা অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং কিছুটা পরিমাপযোগ্য হবে।	মধ্যমেয়াদি
(ঘ)	সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া সরলীকরণঃ প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং জনসাধারণের ঝামেলা কমানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদের নেয়া গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলোক উৎসাহিত করা যেতে পারে এবং অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য এসব উদ্যোগকে স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
(ঙ)	‘সিস্টেম বেজ টোকেন’ঃ একটি অফিসে যেখানে পরিষেবা গ্রহণের জন্য সাধারণত বড় জমায়েত হয় সেখানে সারি (queue) বজায় রাখার জন্য ‘সিস্টেম বেজ টোকেন’ প্রদানের নিয়ম চালু করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
(চ)	সেবা প্রদানের সময় অনুসরণঃ প্রত্যেক পরিষেবার আদর্শ সরবরাহ সময় অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। বিলম্ব বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রার্থীকে অবশ্যই স্বল্পসময়ের মধ্যে অবহিত করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
(ছ)	পরিষেবা সরবরাহের দক্ষতা বা ব্যর্থতা মূল্যায়নঃ সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল স্বাধীনভাবে পরিষেবা সরবরাহের দক্ষতা বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে এবং ক্রটিগুলি নির্ণয়ের সাথে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন অবশ্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে জমা দিতে হবে। এই প্রতিবেদন একটি পাবলিক ডকুমেন্ট।	মধ্যমেয়াদি
(জ)	যুক্তিসংগত বাজেট ও ব্যয়ঃ প্রত্যেক পরিষেবার জন্য বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় যুক্তিসংগত হতে হবে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের সংস্কৃতি চালু করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১১.২	সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনয়নঃ যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ/অনুমোদন প্রক্রিয়ার অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করা একটি সমস্যা, তাই প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার কার্যকর অর্পণ পদ্ধতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত। প্রশাসনিক কার্যপ্রক্রিয়ার জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা ও নীতিমালা প্রয়োন্ন করতে হবে। প্রশাসনিক কার্যপ্রক্রিয়ার মানচিত্র তৈরি করে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে হবে। মন্ত্রণালয়গুলোর সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতিগুলো সরলীকরণ ও মানিকরণ করতে হবে। এবং বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিচে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষমতা অর্পণের পদ্ধতিকে পর্যালোচনা করে কুটির/নিয়মিত কাজের সিদ্ধান্ত যুগ্মসচিব বা তার নিচে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। আমলাতাত্ত্বিক জটিলতা কমাতে একক পরিষেবা কেন্দ্র (one-stop-shop) চালু করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১১.৩	ডিজিটাল রূপান্তরঃ	
	ক) বিদ্যমান ডিজিটাল সেবার একটি মৌলিক মূল্যায়ন/সমীক্ষা পরিচালনা করে ই-গভর্নান্সের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। খ) প্রবেশযোগ্যতা ও দক্ষতার স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে একটি জাতীয় ই-গভর্নান্স কৌশল তৈরি করতে হবে। গ) অনলাইন সেবা সরবরাহের জন্য ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা (যেমন: পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপস)। ঘ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রমের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অভিন্ন জাতীয় ডিজিটাল অবকাঠামো ডাটাবেস তৈরি করা।	মধ্য মেয়াদি

১১.৮	<p>অন্তর্মন্ত্রণালয় সমন্বয়:</p> <p>ক) অন্তর্মন্ত্রণালয় সমন্বয় হল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্মন্ত্রণ সুবিধাযুক্ত ওয়েব পোর্টাল ভিত্তিক সমন্বিত জনসেবা প্ল্যাটফর্ম চালু করার জন্য সুপারিশ করা হলো। কেন্দ্রীয় ওয়েব পোর্টাল এবং স্থানীয় ই-গভর্নর্যাস উদ্যোগের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। বিকেন্দ্রীভূত সেবা প্রদান কেন্দ্রগুলোর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>খ) ডিজিটাল ট্রাকিং সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত/মতামত প্রদানের সুযোগ থাকতে হবে। ডাটা অ্যারেস এবং আন্তর্মন্ত্রণযোগ্য ডাটা শেয়ারিং-এর সুযোগ থাকতে হবে। সরকারি কর্মীদের জন্য ডিজিটাল টুলস ও প্ল্যাটফর্মের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।</p> <p>গ) ওয়েব পোর্টালে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে মতামতের প্রতিক্রিয়া প্রদান করার সুযোগ রাখতে হবে।</p> <p>ঘ) ডিজিটাল ট্রাকিং সিস্টেম কার্যকরভাবে অনুসরণের জন্য প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এভাবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মানিকরণ নিশ্চিত করতে হবে। জনসেবা কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করতে হবে।</p>	মধ্যমেয়াদি
১১.৫	সেবাপ্রার্থীর ক্ষতিপূরণ দাবিঃ সেবাপ্রার্থীকে হয়রানির জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত সহজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিমেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়/বিভাগের একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার কাছে থেকে এই ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবি করতে সক্ষম হওয়া উচিত।	মধ্যমেয়াদি
১১.৬	ক্ষমতার কার্যকর প্রত্যর্পণঃ যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ/অনুমোদন প্রক্রিয়ার অনেকগুলি স্তর একটি সমস্যা, তাই প্রশাসনিক (এবং আর্থিক) ক্ষমতার কার্যকর অর্পণ পদ্ধতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত এবং বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিচে গ্রহণ করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১১.৭	<p>কর্মক্ষমতা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাঃ</p> <p>ক) সরকারি কর্মীদের দক্ষতা মূল্যায়নে মূল কর্মক্ষমতা সূচক (KPI) চালু করতে হবে।</p> <p>খ) নিয়মিত কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান ব্যবস্থা চালু করতে হবে।</p> <p>গ) উচ্চ কর্মদক্ষতা ও উভাবনী সেবার জন্য পুরষ্কার ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।</p> <p>ঘ) কর্মক্ষমতা ভিত্তিক ফলাফল মূল্যায়ন করে নীতি ও কর্মসূচির বার্ষিক মূল্যায়ন করায়েতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি
১১.৮	<p>সংস্কার পদ্ধতি ও পরিবর্তন প্রক্রিয়াঃ</p> <p>ক) স্থানীয় কর্মকর্তাদের গ্রাহকসেবা ও সমাজসংযোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে জনসেবার প্রতি তাদের সদাচরণ ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।</p> <p>খ) নাগরিকদের ডিজিটাল জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা ও জনসংযোগ পরিচালনা করা যেতে পারে।</p> <p>গ) স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার জন্য সাশ্রয়ী ডিজিটাল সমাধান তৈরিতে প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সাথে সহযোগিতা করতে হবে।</p> <p>ঘ) নাগরিক ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইল অ্যাপের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।</p> <p>ঙ) স্থানীয় সরকারি নেতাদের জন্য কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা, যাতে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।</p> <p>চ) এনজিও ও নাগরিক সমাজ সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে সেবার মানোন্নয়ন করা যেতে পারে।</p> <p>ছ) কমিউনিটি-ভিত্তিক মতামত সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করে কার্যকর প্রতিক্রিয়া ও সেবার সন্তুষ্টি মূল্যায়ন করা যেতে পারে।</p>	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় বারো

কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য সংক্ষার

ক। নাগরিক পরিষেবা প্রদানে জনপ্রশাসনের ভূমিকাঃ নাগরিক পরিষেবা প্রদানে জনপ্রশাসনের ভূমিকা কতটা কার্যকর হচ্ছে তা পরিমাপের উপায় হচ্ছে কার্যক্রমটির উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে এবং তা নাগরিকদের চাহিদা পূরণ করেছে কিনা তা নির্ধারণ করা। এর মাধ্যমে সরকারের নানাবিধি কর্মসূচি এবং পরিষেবা কতটা কার্যকর ও সফলভাবে চিহ্নিত সমস্যা নিরসন করা সম্ভব হয়েছে তা নির্ণয় করা যায়। যেমন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ফলে নাগরিকদের রোগ-বালাই কমেছে কিনা বা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কিনা তা জানা যায়। নাগরিক পরিষেবার ফলে নাগরিকদের জীবনমানে উন্নতি ঘটেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা যায়। এর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে অগাধিকার বিষয়।

খ। নাগরিক পরিষেবার কার্যকারিতাঃ নাগরিক পরিষেবার কার্যকারিতার সাথে কতটা দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করা হয়েছে তাও দেখার বিষয় রয়েছে। সেবা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ, সময় ও কর্মচারীদের দক্ষতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। সেবার কার্যকারিতার সাথে সম্পদ ব্যবহারের ফলে কাঞ্চিত মাত্রায় সুফল পাওয়া গেছে কিনা সেটাও দেখতে হয়। পরিষেবা যে লক্ষিত জনগোষ্ঠির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সে জনগোষ্ঠির বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ও ঝুঁকিতে থাকা শ্রেণির কাছে সহজলভ্য হতে হবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, কর্মসূচির সুফল থেকে যেন কেউ বাধ্যত না হয়। পরিষেবা প্রদানের পরে সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য নাগরিকদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) জানার ব্যবস্থা রাখা উচিত। এর ফলে পরবর্তীতে পরিষেবার মান বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে, নির্দিষ্ট পরিষেবাটি যেন টেকসই হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, নাগরিক পরিষেবার কার্যকারিতা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সেবাটি তার উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়েছে কিনা এবং সম্পদ ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে নাগরিকদের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে কিনা।

গ। আমলাতাত্ত্বিক লালফিতার দৌরাত্মাঃ গণতাত্ত্বিক মূল্যবোধের চর্চা না থাকায় নাগরিকরা সরকারের প্রদত্ত পরিষেবায় সন্তুষ্ট কিনা তা জানার কোনো ব্যবস্থা নেই বা তার গরজও কেউ অনুভব করে না। সরকারের বহু কর্মসূচি এমনভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় যা টেকসই হয় না। যেমন একটি সড়ক নির্মাণ যদি মান রক্ষা না করে করা হয়, বরং দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন হয় তাহলে সে প্রকল্পের টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সমাজের যে জনগোষ্ঠি বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ও ঝুঁকিতে থাকে তাদের জন্য টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচি দেখা যায়। সুতরাং নাগরিক পরিষেবা এমন কার্যকারিতার সাথে বাস্তবায়ন করা উচিত যা সত্যিকার অর্থে লক্ষিত জনগোষ্ঠির জন্য টেকসই পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

ঘ। সুপারিশমালাঃ কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য সংক্ষার

১২.১	আমলাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সহজ ও গতিশীল করা	
ক)	নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক পদ্ধতি তথা আমলাতাত্ত্বিক বিধিবিধান সহজতর ও ডিজিটাল করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে জনপ্রশাসনের কার্যক্রমতা বৃদ্ধি পাবে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	সঠিক নীতি-নির্ধারণের স্বার্থে তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা এবং নীতি-নির্ধারকদের কাছে তা পেশ করার নীতি চালু করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	রাষ্ট্রীয় সম্পদ নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ প্রদান টার্গেট জনগোষ্ঠির চাহিদা ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
ঘ)	নাগরিকদের বিবিধ সরকারি পরিষেবা প্রদানের জন্য ওয়ান-স্টেপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা এবং সেখানে তাদের অভিগ্যতা সহজতর করার উদ্যোগ নিতে হবে।	স্বল্পমেয়াদি
ঙ)	একটি গতিশীল ও কার্যকর সিস্টেম চালু করতে হবে যাতে নাগরিকদের মতামত দেয়ার সুযোগ থাকে এবং তারা যেন স্বত্ত্ব বোধ করে যে তাদের কথা শোনা হয়।	মধ্যমেয়াদি

১২.২	কার্য সম্পাদনে প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রয়োগঃ	
ক)	কার্যবিধিমালা, মন্ত্রণালয় / বিভাগের কর্মবন্টগ ও সচিবালয় নির্দেশমালা পর্যালোচনা করে তা সংশোধন বা বিয়োজন এবং অনলাইনে তা সহজলভ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	মন্ত্রণালয় / বিভাগগুলোকে ৫টি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	সরকারি পরিমেবা সহজতর করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টাল স্থাপন করা। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
ঘ)	সরকারি পরিমেবা পদ্ধতি গতিশীল করার জন্য ই-গভর্নেন্স কৌশল বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
ঙ)	ডিজিটাল টুল ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ খাতে বেশি বিনিয়োগ করা। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
চ)	সম্পদ বরাদের ক্ষেত্রে input-output –outcome - impact framework ব্যবহার করা এবং নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে ডিজিটাল জনপ্রশাসন পদ্ধতি চালু করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১২.৩	বৈচিত্র ও অন্তর্ভুক্তিকরণ (Diversity and Inclusion)	
ক)	নাগরিকদের সেবা প্রদান ও সম্পদ বরাদের ক্ষেত্রে নারী ও পিছিয়ে পড়া সুবিধাবন্ধিত জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বৈচিত্র ও অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	শুধু সম্পদ বরাদের যথেষ্ট হবে না, যদি নারী ও পিছিয়ে পড়া সুবিধাবন্ধিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় তা পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা না যায়।	মধ্যমেয়াদি
১২.৪	পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণঃ	
ক)	আমাদের পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নীতি-কৌশল নির্ধারণ ও প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়নের আগে পরিবেশ সমীক্ষা ও তার প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে অস্তওন্ত্রণালয় ও আন্ত-বিভাগীয় সমবয়সাধন জোরদার করতে হবে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
ঘ)	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে জেলা, উপজেলা জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১২.৫	জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন (Adaptation)	
ক)	জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলকে সরকারি নীতি-কৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	দীর্ঘমেয়াদী
খ)	স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।	দীর্ঘমেয়াদী
গ)	সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় টিকে থাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও সম্পদ বরাদে করতে হবে।	দীর্ঘমেয়াদী

১২.৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ	
ক)	দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি-কাঠামো ও দুর্যোগ-পূর্ব সংকেত প্রদান ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও বুঁকি মোকাবিলার জন্য সময়মত যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিমাণে তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও-দের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	মধ্য মেয়াদি
১২.৭	জেলা ও উপজেলার সাথে কেন্দ্রের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ	
ক)	স্থানীয় ই-গভর্নেন্স সিস্টেমের সাথে কেন্দ্রীয় ওয়েব পোর্টলের এবং মোবাইল সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
খ)	জনপরিষেবা গ্রহণকারী বিশেষ করে কৃষক, মহিলা, জেলে প্রত্তি শ্রেণির নাগরিকরা যাতে সহজে সেবা পেতে পারে সেজন্য সহজগম্য স্থানে সার্ভিস ডেলিভারী পয়েন্ট স্থান করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনপরিষেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় তেরো

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস সংস্কারে বিশেষ সুপারিশমালা

ক। স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাঃ দেশের সংবিধান, জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ যেমন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) আলোকে বাংলাদেশ সরকার সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিদ্যমান অনেক ধরণের প্রতিবন্ধকতা মানসম্মত ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাণ্প্রিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলোর কারণে তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী নিম্ন আয়ের মানুষ ও সুবিধাবানিত গোষ্ঠী। একদিকে, যথাযথ ও মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা না থাকায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দক্ষ চিকিৎসক তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে, মানসম্মত প্রশিক্ষণের অভাবে মেধাচর্চা ব্যাহত হওয়ায় দক্ষ সেবাদানকারী চিকিৎসক, চিকিৎসা শিক্ষক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য প্রশাসক তৈরি হচ্ছে না।

চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান, সুষম ব্যবস্থাপনা, দূরদর্শী পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামের অভাবে দক্ষ ও মানবিক চিকিৎসক তৈরি বাধাপ্রস্তু হচ্ছে। এ কারণে World Federation for Medical Education (WFME) বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহের এক্রিডিটেশন বন্ধ রেখেছে। এর ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এবিষয়ে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার কাজ শুরু করা দরকার।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন মনে করে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর জনবান্ধব, যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা এখন সময়ের দাবি। এজন্য স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনবল তৈরি করা এবং মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে রোগীদের সেবার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যাপক সংস্কার করা প্রয়োজন। যেহেতু স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন কাজের সাথে জনপ্রশাসনের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে সেহেতু এ কমিশন স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের জন্য কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা জরুরি বিবেচনা করছে। উদাহরণ স্বরূপ- স্বাস্থ্য খাতের শুধু চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থাপনার বিষয় রয়েছে। এ বিরাট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিদ্যমান কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন।

খ। স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে মোট সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ১১০টি, ডেন্টাল কলেজ ১৩টি, আইএইচটি ১২৮টি, ম্যাটস ২১৬টি, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ ৫টি এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠান ২৩টি। অপরদিকে, প্রতিটি জেলা সদরে ৬৫টি সিভিল সার্জন অফিস ও হাসপাতাল, ৪৩০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১৪,৩৫৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ১৮টি স্বাস্থ্য ইনসিটিউট স্বাস্থ্য সেবার কাজে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে, ৩২৯০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ২৮৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ৪টি পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

গ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জনবল কাঠামোঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছয়টি মূল অংশ চিহ্নিত করেছেং নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান, স্বাস্থ্যকর্মী (HWF), অর্থায়ন, প্রয়োজনীয় ওষুধে প্রাণ্প্রিক এবং স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা। এ উপাদানগুলোর কার্যকারিতা সম্মিলিতভাবে একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক শক্তি এবং দুর্বলতা নির্ধারণ করে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে অতির্ভুক্ত রয়েছে চিকিৎসক, নার্স, ধাত্রী, টেকনোলজিষ্ট, ফার্মাসিস্ট, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী, সেবাদানকারী এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহায়তাকারী কর্মী। এরা সবাই সেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যান্য অংশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে, কাঠামোগত সমস্যার কারণে তাদের কর্মক্ষমতা প্রায়ই প্রত্যাশিত মানের নিচে থাকে। বাংলাদেশের সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য খাতে ১ম থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত অনুমোদিত পদ ২,৩৬,৮২৮ টি। এর মধ্যে কর্মরত মোট জনবল হচ্ছে ১,৭৩,২৬১। মোট ৬৩,৫৭১টি পদ শূন্য রয়েছে যা মোট পদের ২৭% ভাগ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অন্যতম বৃহৎ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, যা একটি বিশাল স্বাস্থ্যকর্মী দলের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বর্তমানে (২০২৪) নিয়োজিত মোট চিকিৎসক হচ্ছে ৩৪,৪৩৫ জন। এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে রয়েছে আরো ১১২০ জন কর্মকর্তা ও ২৩,৫০০ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী। এর মধ্যে ২৯,৭৪৩ জন হচ্ছেন বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা।

ঘ। স্বাস্থ্যকর্মী পরিচালনার চ্যালেঞ্জসমূহঃ যদিও বর্তমান কাঠামো কিছুটা ভারী বলে মনে হয় এবং এর পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকতে পারে, স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজনীয়তা উচ্চ মাত্রায় রয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন গুরুতর চ্যালেঞ্জের সমূখীন হয়, যার মধ্যে রয়েছে কর্মীর ঘাটতি, উচ্চ শূন্যপদের হার, গ্রামীণ-শহরে বৈষম্য এবং ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা। এ চ্যালেঞ্জগুলো বিশেষ করে গ্রামীণ এবং সুবিধাবানিত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

ঙ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ঃ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে দুটি প্রথক বিভাগে ভাগ করা হয়ঃ
(১) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং (২) চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। এ বিভাজন ব্যবস্থাপনার উন্নতি করার পরিবর্তে বেশ কিছু
সমস্যা তৈরি করেছে। প্রথমতঃ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পূর্বের
মত বহাল রেখেছে। অপরদিকে, চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ চিকিৎসা শিক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনার জন্য দায়িত্ব
পালন করছে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিভাগগুলো স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে, তাদের নিজস্ব বাজেট এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে। কোনো
বিষয়ে একাধিক বিভাগের জড়িত থাকলে আন্তমন্ত্রণালয় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পূর্বে, এ ধরনের পদায়ন
আন্তমন্ত্রণালয় আলোচনার প্রয়োজন হতো না। নতুন এ ব্যবস্থায় আমলাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জটিলতা বেড়েছে।

চ। বিভাজন থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহঃ বিভাজনের ফলে নির্দিষ্ট কিছু শাখায় নতুন পদ তৈরি হয়েছে, যা জনসাধারণের আর্থিক
ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, তবে এর সাথে কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়নি। দ্বৈত রিপোর্ট লাইন বিভাস্তি সৃষ্টি করেছে। দুই
বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব পুনর্বর্ণনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিভাজনের অভাব রয়েছে। এ অস্পষ্টতা ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে অদক্ষতাকে
বাড়িয়েছে। প্রশাসনিক কাঠামোর অনুলিপি তৈরি করার ফলে সম্পদের ওপর চাপ পড়েছে। বিভাগের ওভারল্যাপিং ভূমিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ
এবং অপারেশনাল প্রক্রিয়াগুলোতে বিলম্ব এবং অদক্ষতা সৃষ্টি করেছে।

ছ। স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতিঃ বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ জনে ১১.৭০ জন চিকিৎসক (জুন ২০২২) কর্মরত ছিলেন। এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা
অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘার (WHO) সুপারিশ মোতাবেক প্রতি ১০,০০০ জনে ২০২৫ সালে ৩১.৫ এবং ২০৩০ সালে ৪৪.৫ জন
চিকিৎসক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় থাকার কথা বলা হয়েছে। চাহিদা মোতাবেক উৎপাদনে অক্ষমতা, সময় উপযোগী নীতিমালার অভাব এবং
উপলব্ধিতার সীমাবদ্ধতার কারণে অল্প সময় বা মাঝারি সময়ের মধ্যে এ অনুপাত অর্জন করা কঠিন হতে পারে। তদুপরি, কর্মীদের
বিতরণেও বৈষম্য রয়েছে, যেখানে শহরে এলাকায় প্রতি ১,৫০০ জনে একজন চিকিৎসক পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় এই
অনুপাত ১:১৫,০০০। এ অসমতা স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং গ্রামীণ জনগণের কাঙ্খিত সেবা থেকে বঞ্চিত
করে।

জ। উচ্চ শূন্যপদের হারঃ অনেক পদ দীর্ঘ সময় ধরে শূন্য থাকে। একটি রিপোর্ট (HLMA, 2021) অনুযায়ী অনুমোদিত পদের
বিপরীতে জেনারেল ফিজিসিয়ান এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি যথাক্রমে ২৫% এবং ৫৮%। নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা,
স্বচ্ছতার অভাব, পদায়ন ও পদোন্নতিতে স্থুবি঱্ঠতা এবং আইনি জটিলতার কারণে বিদ্যমান কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে
এবং সেবার মান কমে যাচ্ছে।

ঝ। গ্রামীণ-শহরে বৈষম্যঃ শহরাঞ্চলগুলোতে কর্মী সংখ্যা অনুমোদিত পদের তুলনায় প্রায় ৪২% বেশি, যেখানে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে
তৈরি কর্মী সংকট বিদ্যমান। অনেক উপজেলায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে, যা ২৪/৭ জরুরি মাত্র ও নবজাতক সেবা প্রদানের
ক্ষমতা সীমিত করে।

ঝ। দ্বৈত অনুশীলনঃ অনেক সংখ্যক সরকারি চিকিৎসক ব্যক্তিগত অনুশীলনে নিযুক্ত হন, যা অনেক ক্ষেত্রে কর্মঘন্টার অপচয় ঘটে। এ
বিষয়ে পরিষ্কার নীতিমালা তৈরি করা দরকার। বিশাল জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা দেবার বিষয়টি মাথায় রেখে ইনসিটিউটিশনাল
প্রাকটিসের ব্যবস্থা করা দরকার।

ট। নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষণের ঘাটতিঃ সরকারি স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা, বিশেষ করে অফিস প্রধানরা, ক্রয় এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায়
উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এর মূল কারণ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দক্ষতা তৈরিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব।

ঠ। স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের জন্য মতবিনিয়য় ও সমীক্ষাঃ স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিবার
পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, সরকারি ইনসিটিউটসমূহের প্রতিনিধি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত সম্মানিত চিকিৎসকগণ এবং স্বাস্থ্য
সংস্কার কমিশনের দুইজন প্রতিনিধি এক মতবিনিয়য় সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সকল অধিদপ্তরের পক্ষে মোট ৫টি উপস্থাপনা
পেশ করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বাস্থ্য সার্ভিস সংস্কার বিষয়ে একটি যৌথ সমীক্ষা পরিচালিত হয়।
সমীক্ষায় স্বাস্থ্য সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২৫২৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সমীক্ষার ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলোঁ:

(ক) মোট শতকরা ৭১% চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানে
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব।

- (খ) শতকরা ৬১% চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পরিবর্তে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস গঠন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য আলাদা একটি স্বাস্থ্য সার্ভিস কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।
- (গ) শতকরা ৯৮% চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে স্বাস্থ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের আরো প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রত্যর্পন করা প্রয়োজন।
- (ঘ) শতকরা ৮২% চিকিৎসক তাদের কর্ম পরিবেশের উন্নতি ও নিরাপত্তা বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
- (ঙ) শতকরা ৮২% চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, তাদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
- (চ) শতকরা ৯০% চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, তাদেরকে সময়মত ও নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত।
- (ছ) শতকরা ৭৮% চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, তাদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- (জ) উল্লেখ্য যে, শতকরা ৫৮% চিকিৎসক মনে করেন যে, স্বাস্থ্য সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ড। দেশব্যাপী ফিজিওথেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপি চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালুকরণঃ বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ শারীরিক নানা ধরনের ব্যথা, ব্যথাজনিত উপসর্গ ও প্রতিবন্ধিতার শিকার। তাদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম জীবনে ফিরিয়ে আনতে ফিজিওথেরাপি অন্যতম চিকিৎসাসেবা। ব্যথা ছাড়াও প্রৌঢ় জনগোষ্ঠীর বার্ধক্যজনিত সমস্যা, স্ট্রেক, প্যারালাইসিস, সেরিব্রাল পালসি, অটিজম, মেরুদণ্ডে আঘাত, সড়ক দুর্ঘটনা, ক্যানসার, অবেসিটি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ নানাবিধ অসংক্রামক রোগের কারণে বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক বড় একটি অংশ আংশিক বা পুরোপুরি প্রতিবন্ধিতায় ভুগছে। এই ব্যথা ও প্রতিবন্ধিতার প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি।

বর্তমানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশে ০৯ (নয়) টি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে বি.এস.সি ইন ফিজিওথেরাপি কোর্স চালু রয়েছে এবং প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ফিজিওথেরাপিতে গ্রাজুয়েশন কোর্স সম্পন্ন করছে। এ পর্যন্ত দেশে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপি বিষয়ে প্রায় দশ হাজার ফিজিওথেরাপিস্ট ম্লাতক, ম্লাতকউভর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তাদেরকে সরকারি চাকরি প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা কাজে নিযুক্ত করা গেলে দেশের নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের খুবই উপকৃত হবে।

চ। সুপারিশমালাঃ বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস সংস্কারে বিশেষ সুপারিশমালাঃ

১৩.১	পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠনঃ অত্র প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে বিসিএস ক্যাডারের পরিবর্তে প্রত্যেক সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পরিবর্তে স্বতন্ত্র ‘বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস’ নামকরণ করা হবে। ‘বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস-এ’ জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি পরীক্ষা ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য আলাদা একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করার সুপারিশ করা হলো। বিষয়টি নিয়ে পুর্খানুপুংখরপে আলোচনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি টাঙ্কফোর্স গঠনের সুপারিশ করা হলো।	স্বল্পমেয়াদি
১৩.২	স্বাস্থ্য সার্ভিসের জনবল কাঠামো পুনর্নির্ধারণঃ বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিসের জনবল কাঠামো পুনর্নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিক বিশেষ করে বৃহদাকার জনবলের বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করে সার্ভিসের জনবল কাঠামো পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব তৈরি করা যেতে পারে এবং প্রস্তাবিত স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের নিকট প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.৩	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পুনর্গঠনঃ স্বাস্থ্য সার্ভিসের জনবল কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত। এই ধরনের সংস্কার বাস্তবায়ন করলে দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ সমস্যার সমাধান হবে এবং উভয় শাখার দক্ষতা ও ফোকাস উন্নত হবে, যা শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।	মধ্যমেয়াদি

১৩.৪	<p>ক্যারিয়ার প্লানিং ও ডেপুটেশন পলিসি : 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস'-এর সকল স্তরের জন্য একটি ক্যারিয়ার প্লানিং প্রণয়ন করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১৩.৩ অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-এরপ তিনটি শ্রেণি বিভাজন করা হলে ক্যারিয়ার প্লানিং সহজ হবে। ডেপুটেশন পলিসি-তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে হবেঃ</p> <p>ক) এমবিবিএস পরীক্ষার রেজাল্ট, খ) ইন্টার্নশীপ ও গ্রামে অবস্থানকালীন কর্মক্ষমতা (পারফরমেন্স)। ই-লগবুক এর মাধ্যমে মূল্যায়ণ করা হলে চিকিৎসকরা গ্রামে সেবা দিতে উৎসাহিত হবে। গ) স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চাহিদাভিত্তিক বিষয় প্রদান করা, এবং ঘ) প্রার্থীর পছন্দ।</p>	মধ্যমেয়াদি															
১৩.৫	<p>লাইন প্রমোশনঃ স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-এরপ তিনটি বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য লাইন প্রমোশন দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পদসোপান তৈরি করা যেতে পারে। এ তিনটি পদসোপানের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে তা নিয়ে অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন হবে।</p> <p style="text-align: center;">সারণি-১২: স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ক্লিনিকাল ও শিক্ষা সংক্রান্ত পদগুলোর পদবিন্যাস</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>জনস্বাস্থ্য</th> <th>স্বাস্থ্যশিক্ষা</th> <th>ক্লিনিকাল</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>বিভাগীয় পরিচালক</td> <td>অধ্যাপক</td> <td>চীফ কনসালট্যান্ট</td> </tr> <tr> <td>সিভিল সার্জন</td> <td>সহযোগী অধ্যাপক</td> <td>সিনিয়র কনসালট্যান্ট</td> </tr> <tr> <td>উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিসার</td> <td>সহকারী অধ্যাপক</td> <td>জুনিয়র কনসালট্যান্ট</td> </tr> <tr> <td>মেডিক্যাল অফিসার/আরএমও</td> <td>প্রভাষক</td> <td>রেজিস্ট্রার সহকারী রেজিস্ট্রার</td> </tr> </tbody> </table>	জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্যশিক্ষা	ক্লিনিকাল	বিভাগীয় পরিচালক	অধ্যাপক	চীফ কনসালট্যান্ট	সিভিল সার্জন	সহযোগী অধ্যাপক	সিনিয়র কনসালট্যান্ট	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিসার	সহকারী অধ্যাপক	জুনিয়র কনসালট্যান্ট	মেডিক্যাল অফিসার/আরএমও	প্রভাষক	রেজিস্ট্রার সহকারী রেজিস্ট্রার	মধ্যমেয়াদি
জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্যশিক্ষা	ক্লিনিকাল															
বিভাগীয় পরিচালক	অধ্যাপক	চীফ কনসালট্যান্ট															
সিভিল সার্জন	সহযোগী অধ্যাপক	সিনিয়র কনসালট্যান্ট															
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিসার	সহকারী অধ্যাপক	জুনিয়র কনসালট্যান্ট															
মেডিক্যাল অফিসার/আরএমও	প্রভাষক	রেজিস্ট্রার সহকারী রেজিস্ট্রার															
১৩.৬	'সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস'-এ প্রবেশের সুযোগঃ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস'-এ প্রবেশের জন্য অন্যান্য সার্ভিসের মতো স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তারাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।	মধ্যমেয়াদি															
১৩.৭	প্রাথমিক নিয়োগের বয়সসীমা বৃদ্ধিঃ 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস'-এ প্রাথমিক নিয়োগের বয়সসীমা দুই বছর বৃদ্ধির বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন।	মধ্যমেয়াদি															
১৩.৮	মেডিকেল কলেজ ও শিক্ষার্থী সংখ্যা যৌক্তিকীকরণঃ দেশের জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় রেখে মেডিকেল কলেজ ও শিক্ষার্থী সংখ্যা সম্পদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। একই বিবেচনায় বিদ্যমান কলেজগুলোর মানোন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য শিক্ষায় শিক্ষকের ঘাটাতি প্ররোচনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি															
১৩.৯	সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো এবং একাডেমিক ও সার্ভিস হাসপাতাল পৃথকীকরণঃ স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগকে পরিপূর্ণভাবে বিভাজন করে দেশের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একাডেমিক ও সার্ভিস হাসপাতাল-এরপ দু'ভাবে ভাগ করে তাদের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ স্ব স্ব বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। সকল স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো অঞ্চাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা জরুরি।	মধ্যমেয়াদি															
১৩.১০	ঢাকার বাইরে বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানঃ বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকার বাইরের স্থানগুলোকে অঞ্চাধিকার দেওয়া উচিত।	দীর্ঘমেয়াদি															
১৩.১১	প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল নিয়োগঃ কোনো নতুন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বেই প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত।	মধ্যমেয়াদি															
১৩.১২	উপস্থিতি নিশ্চিতকরণঃ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরার পাশাপাশি সরেজমিনে তদারকি বাঢ়াতে হবে। বিধিবিহীনভাবে কেউ অনুপস্থিত থাকলে বিধি মেতাকে শান্তি নিশ্চিত করতে হবে।	স্বল্পমেয়াদি															

১৩.১৩	গ্রাম এলাকায় চিকিৎসক পদায়নঃ সরকারি চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যথাযথ নির্দেশনার অভাব গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত থাকা চ্যালেঙ্গ তৈরি করে। ডেপুটেশন পলিসি, পদায়ন ও পদোন্নতিতে গ্রাম এলাকায় কর্মরত থাকার বিষয়টি ই-লগবুকের মাধ্যমে সমতার ভিত্তিতে করা গেলে বিষয়টির কিছুটা সূরাহা হবে বলে আশা করা যায়। গ্রামীণ সেবা ও স্বাস্থ্যসেবার চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কৌশলগত কর্মশক্তি পরিকল্পনা এবং নীতি সংকারে প্রযুক্তির ব্যবহার বাঢ়ানো যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.১৪	প্রশিক্ষণ নীতিমালাঃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া উচিত। একটি প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে কর্মকর্তারা জাতীয় স্বাস্থ্য অধিকার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে নয়।	মধ্যমেয়াদি
১৩.১৫	অধিকতর স্বায়ত্ত্বাসনঃ বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর স্বায়ত্ত্বাসন দেওয়া যেতে পারে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.১৬	সিএসআর কর্মসূচিঃ দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজগুলোকে তাদের সিএসআর কর্মসূচি হিসেবে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষুধ প্রদানের আহ্বান জানানো যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.১৭	রোগীর সংখ্যা অনুপাতে বাজেট বরাদ্দঃ সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যার পরিবর্তে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা অনুপাতে বাজেট বরাদ্দ করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.১৮	দালালদের দৌরাত্ম অবসানঃ অধাধিকার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে দালালদের দৌরাত্ম অবসানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। প্রতিটি হাসপাতালের সেবাসমূহকে পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে। প্রতিদিন কতটি বেডে কতজন রোগী আছে তা ড্যাশ বোডে (ডিজিটাল) টানিয়ে দিতে হবে।	স্বল্পমেয়াদি
১৩.১৯	স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইনঃ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের স্বার্থে ভারসাম্য রেখে ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ন করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.২০	ল্যাবরেটরিগুলোর মান নিয়ন্ত্রণঃ অধাধিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ল্যাবরেটরিগুলোর মান গ্রহণের জন্য একটি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.২১	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাঃ স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.২২	ফিজিওথেরাপি বিভাগ এবং ফিজিওথেরাপিষ্ট পদ সৃষ্টিঃ দেশের সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, আই, এইচ, টি. এবং সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সদর/জেনারেল হাসপাতালসমূহে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার জন্য ফিজিওথেরাপি বিভাগ এবং ফিজিওথেরাপিষ্ট পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হলো। এ সম্পর্কিত একটি সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো সংযুক্ত--১১ তে রাখা হয়েছে।	মধ্যমেয়াদি
১৩.২৩	কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনাঃ গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য খাতে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। সরকার কতগুলো সুনির্দিষ্ট শর্তে বাজেট বরাদ্দ দিয়ে কেন্দ্রগুলো পরিচালনা আউটসোর্স করবে। উপজেলা নিবাহী অফিসার, স্বাস্থ্যকর্মকর্তা ও অভিভূত বেসরকারি সদস্য নিয়ে একটি কমিটি এনজিওগুলোর কাজ তদারকী করতে পারেন।	স্বল্পমেয়াদি

অধ্যায় চোদ্দশ

বাংলাদেশের শিক্ষা সার্ভিসের সংক্ষারের জন্য বিশেষ সুপারিশ

ক। বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোঃ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো একটি বহুবীজী এবং স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা। এটি প্রধানত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত, যা শিক্ষার্থীদের বয়স, সক্ষমতা, এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনে নির্ভর করে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং এখানে ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম এবং ধর্মীয় শিক্ষা কাঠামোও রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের শিক্ষার কাঠামো বর্ণিত হলঃ

সারণি-১৫৪ বাংলাদেশের শিক্ষার কাঠামো

ক্রমিক	শিক্ষার স্তর	বয়স	নন	কাঠামো
১.	প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)	৬ থেকে ১০ বছর	১ম থেকে ৫ম শ্রেণি	সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা সাধারণ জ্ঞান, গণিত, বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান সহ মৌলিক বিষয়গুলি শেখে।
২.	মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)	১১ থেকে ১৬ বছর	৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি	এই স্তরে শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা, স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করতে পারে। মাধ্যমিক স্তর দুটি ভাগে বিভক্ত: জেএসসি (Junior School Certificate): ৮ম শ্রেণি পর্যন্তএসএসসি (Secondary School Certificate): ১০ম শ্রেণি পর্যন্তএই স্তরে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক বিষয়াদি ইত্যাদি অধ্যয়ন করা হয়।
৩.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (Higher Secondary Education)	১৭ থেকে ১৮ বছর	১১শ ও ১২শ শ্রেণি	এই স্তরে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করতে পারে, যেমন বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি: এই স্তরে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এইচএসসি (Higher Secondary Certificate): এই স্তরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করে।
৪.	উচ্চতর শিক্ষা (Higher Education)	১৮ বছর এবং তার বেশি	বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, টেকনিক্যাল ইনসিটিউট	বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষা বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করা হয়। এখানে ম্যাত্রক (Undergraduate), ম্যাতকোন্ত (Postgraduate), ডক্টরেট (PhD) পর্যায়ের কোর্সে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে যেমন প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, ব্যবসায়িক প্রশাসন, সাহিত্য, আইন, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে পারে।
৫.	ধর্মীয় শিক্ষা (Religious Education)	বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা সারা দেশে মাদ্রাসা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এখানে ইসলামী শিক্ষা সহ অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এবং এটি মূলত আলিম, ফাজিল, কামিল, হেফজ ইত্যাদি পর্যায়ে হয়ে থাকে।		

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো মূলত দেশের জনগণের শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে, তবে এই ব্যবস্থায় নানা চ্যালেঞ্জ যেমন অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক সংকট, পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন ইত্যাদি রয়েছে।

খ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যাঃ বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে, কারণ সরকারের "মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকার" নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে, যেখানে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হয়। ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট প্রায় ৫ লাখ শিক্ষক রয়েছেন, যাদের মধ্যে সরকারি স্কুল শিক্ষক প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষক এবং বেসরকারি স্কুল শিক্ষক প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষক। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং আধুনিক পাঠদানের কৌশল শেখে। সরকার শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) মাধ্যমিক স্কুল: প্রায় ২০,০০০+ সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল; (২) মাদ্রাসা: প্রায় ১২,০০০+ মাদ্রাসা রয়েছে; (৩) প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বিভিন্ন টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজও রয়েছে, যেখানে পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (Higher Secondary Education): উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাদেশের ১১ম এবং ১২ম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে শিক্ষার্থীরা এইচএসসি (Higher Secondary Certificate) পরীক্ষা দেয়। এই স্তরটি মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থী এইচএসসি স্তরে পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে সরকারি কলেজে প্রায় ১৫-১৬ লাখ শিক্ষার্থী। বেসরকারি কলেজে প্রায় ৮-৯ লাখ শিক্ষার্থী। কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষক (সরকারি ও বেসরকারি কলেজ মিলিয়ে)। বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে: সরকারি কলেজ: প্রায় ২,০০০ সরকারি কলেজ এবং বেসরকারি কলেজ: প্রায় ৫,০০০ বেসরকারি কলেজ।

ঘ. উচ্চশিক্ষাঃ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, এবং বর্তমানে দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে। উচ্চশিক্ষায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট (Ph.D.) পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ত্রুটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে প্রায় ৭-৮ লাখ শিক্ষার্থী। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫-৬ লাখ শিক্ষার্থী। মাদ্রাসা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বাকি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন টেকনিক্যাল, প্রফেশনাল, এবং অনলাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এসব প্রতিষ্ঠান পেশাদারি শিক্ষা প্রদান করে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী শিক্ষক সংখ্যা: প্রায় ৫০,০০০ শিক্ষক (সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে)। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার মধ্যে ৪৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রায় ১০০টিরও বেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া অনেক কলেজ এবং টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে স্নাতক ও অন্যান্য পেশাদারী কোর্স চালু রয়েছে।

ঙ। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি সুসংগঠিত কাঠামো রয়েছে, যা দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সিস্টেম পরিচালনা, পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধাপে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষার ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম দেওয়া হলোঃ

সারণি-১৬ : বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	দায়িত্ব
১.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	এটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, এবং টেকনিক্যাল শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা এবং কার্যক্রম পরিচালনা করে।
২.	উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ এবং পরিদর্শন। এটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	দায়িত্ব
৩.	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে।
৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	মাধ্যমিক (বিদ্যালয়) ও উচ্চমাধ্যমিক (কলেজ) স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা। এসএসসি এবং ইইচএসসি পরীক্ষার আয়োজন, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, এবং কলেজগুলোর নিয়ম-নীতি নির্ধারণ।
৫.	কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা এবং মান নিয়ন্ত্রণ। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে।
৬.	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ। মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা নীতি নির্ধারণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৭.	বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড	মাধ্যমিক (এসএসসি) এবং উচ্চমাধ্যমিক (ইইচএসসি) পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন, ফলাফল প্রকাশ, এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন।
৮.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চুরি কমিশন	বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিচালনা, বাজেট বরাদ্দ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য কাজ করে।
৯.	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রশংসন এবং সংশোধন। শিক্ষাক্রমের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ।
	জাতীয় মেধা অনুপ্রেরণা বোর্ড	শিক্ষা ব্যবস্থার গবেষণা এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য নীতি তৈরি।

চ। বাংলাদেশে শিক্ষা সার্ভিস কমিশনঃ দেশের সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের শিক্ষা খাতে প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা বিচেন্নায় তার ব্যবস্থাপনা ও মানগত বিষয় নিশ্চিত করার জন্য পৃথক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস কমিশন নামে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হলে বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা থাকতেই পারে। তবে এটি শিক্ষকদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য একটি বিশেষ বিশ্বস্ত সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে। শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন করলে শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং ন্যায্য হবে। এটি রাজনৈতিক প্রভাব এবং অসাংবিধানিক প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে, যার ফলে দক্ষ এবং যোগ্য প্রার্থীরা সঠিকভাবে নিয়োগ পাবেন। এ কমিশনটি শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশাদারি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যা দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনে সাহায্য করবে। নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সঠিক এবং মানসম্মত হবে। এ ছাড়া শিক্ষকরা নিয়মিত পদোন্নতি এবং প্রশিক্ষণ পেতে পারেন। এটি তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াবে এবং শিক্ষাদানের মান উন্নত করবে। প্রস্তাবিত কমিশনটি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন ও মনিটরিং করতে পারে, যা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক একই ধরনের নিয়মাবলি এবং দিকনির্দেশনায় কাজ করবে, যা সুশৃঙ্খল এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশে একটি শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন করার ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি সুসংহত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে। এ কমিশনটি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার ও প্রযোজনশীল শিক্ষাবিদদের দ্বারা গঠিত হবে, যা পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাপনায় বিপুল পরিবর্তন আনতে সহায় করবে।

ছ। সুপারিশঃ বাংলাদেশের শিক্ষা সার্ভিসের সংস্কারের জন্য বিশেষ সুপারিশ

১৪.১	বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠনঃ এই প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে বিসিএস ক্যাডার বাতিল করে প্রত্যেক সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের পরিবর্তে ‘বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস’ নামকরণ করা হবে। ‘বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস-এ’ জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি পরীক্ষার কাজ সম্পাদনের জন্য আলাদা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) গঠন করার সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি
১৪.২	নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থাঃ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ৯ম ছেড়ে থেকে ১ম ছেড়ে পৌঁছানোর সুযোগসহ নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখার জন্য সুপারিশ করা হলো। এ জন্য একটি পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। পদোন্নতির ভিত্তি হবে দক্ষতা, কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা। নতুন শিক্ষা সার্ভিস কমিশনের নিয়ন্ত্রণে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা/মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত করতে হবে। শিক্ষা ক্যাডারের অন্ততঃ ৫% অধ্যাপককে জাতীয় বেতন ক্ষেত্রের দ্বিতীয় ছেড়ে উন্নীত করতে হবে। যারা পিএইচডি ডিগ্রীধারী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হিসেবে ৫ বছর চাকরি করেছেন এমন অধ্যাপকদেরও মধ্য হতে দ্বিতীয় ছেড়ে উন্নীত হবে।	মধ্যমেয়াদি
১৪.৩	বাধ্যতামূলক গবেষণাঃ মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরির জন্য সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ে পদোন্নতিতে অন্তত তিনটি মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যাপক পদে অন্তত পাঁচটি গবেষণা বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (ইন্ডেক্সড) জর্নালে গবেষণা প্রকাশিত হতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১৪.৪	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনঃ বাংলাদেশে ২২০০ টির অধিক কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ্যান চালু আছে। ঢাকা শহরে অবস্থিত সাতটি কলেজই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুত। এসব কলেজের শিক্ষা প্রশাসন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে এবং শিক্ষার্থীগণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সনদ লাভ করে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অধিকন্তে এত বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের ১১টি অন্যদের আওতায় ৪৫ টি বিভাগে অধ্যয়নরত প্রায় ৩৪ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটি দুর্বল কাজ। এতে প্রতিনিয়তই মানব সম্পদ বিকাশের প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। যেহেতু বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সেহেতু সংশ্লিষ্ট এলাকার ডিগ্রী পর্যায়ের কলেজগুলোকে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে।	মধ্যমেয়াদি
১৪.৫	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১টি করে প্রধান কলেজ নির্বাচনঃ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১টি করে প্রধান কলেজ নির্বাচন করে সেগুলোকে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যাতে এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কাছাকাছি হতে পারে। এসব কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল সংক্ষমতা দ্রুত পরীক্ষা করতে হবে এবং উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। পিএইচডি ডিগ্রীধারী এবং যাদের গবেষণা প্রকশন আছে এমন শিক্ষকদেরকে এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ/পদায়ন করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১৪.৬	পৃথক মাধ্যমিক অধিদণ্ডের প্রতিষ্ঠাঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদণ্ডের হতে মাধ্যমিক বিভাগকে পৃথক করে আলাদা মাধ্যমিক অধিদণ্ডের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা অঙ্গীভূত থাকার কারণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পাচ্ছে না এবং ক্রমেই মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে। তাই এটি আলাদা হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।	মধ্যমেয়াদি
১৪.৭	কলেজ শিক্ষা অধিদণ্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদণ্ডের থেকে মাধ্যমিক বাদ দিয়ে কলেজ শিক্ষা অধিদণ্ডের করা যেতে পারে এবং মহাপরিচালকের পদ-কে ছেড়-১ উন্নীত করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৪.৮	কলেজ পর্যায়ে অনার্স চালুঃ কলেজ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষায় দৈত-শাসন অবসানের লক্ষ্যে সমন্বয় বৃক্ষি করতে হবে। অনার্স চালুর জন্য শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি কলেজ পর্যায়ে অনার্স চালু যতটুকু সম্ভব সীমিত করতে হবে।	মধ্যমেয়াদি

১৪.৯	ন্যাশনাল একাডেমী ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট (নায়েম)-কে যুগোপযোগী করতে হবে যাতে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করতে পারে। বিভাগীয় পর্যায়ে নায়েমের আঞ্চলিক অফিস করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সমর্থোত্তা স্মারক করা যেতে পারে।	দীর্ঘমেয়াদি
১৪.১০	কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নঃ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণি থেকে কারিগরি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পলিটেকনিক ইন্সটিউটসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মান সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	দীর্ঘমেয়াদি
১৪.১১	মাদ্রাসা শিক্ষার সংক্রান্ত:	
ক)	সকল বিভাগে সরকারি পর্যায়ে বিশেষায়িত (উচ্চ শিক্ষা) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে মহিলা সরকারি মাদ্রাসা (এবতেদায়ী থেকে আলিয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সকল বিভাগীয় পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যেতে পারে।	দীর্ঘমেয়াদি
খ)	মাদ্রাসা পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিশ্চিতের জন্য এবদেতায়ী/প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদেয় সকল সুবিধা নিশ্চিত করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
গ)	বেসরকারি পর্যায়ের মানসম্পন্ন মাদ্রাসাগুলোকে বিশেষ মনিটরিং ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষ করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
ঘ)	বেসরকারি পর্যায়ে মাদ্রাসার মানসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগের জন্য নীতিমালা তৈরি করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৪.১২	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগঃ বর্তমানে দেশে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা খুবই কম। এর ফলে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে পাঠ্দান সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যা দূর করার জন্য শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করা হলো। একই সাথে শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরনের জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করা হলো।	দীর্ঘমেয়াদি
১৪.১৩	কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি গঠনঃ মাঠ পর্যায়ে নাগরিক ও শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতীয়মান হয় যে, কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট থাকায় নানারকম সমস্যা হতো। তারা সরকারি অফিসারদের নিয়ে বেসরকারি কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার পক্ষে জোরালো মত দিয়েছেন। কমিশন নাগরিক সমাজের মতামতের প্রতি সমর্থন জানায়।	ঘন্টামেয়াদি
১৪.১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষক সংকটঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলা ও উপজেলায় মারাত্মক শিক্ষক সংকট রয়েছে। দূর্গম এলাকা বিধায় সেখানে শিক্ষকরা যেতে চান না। এলাকাবাসীর সুপারিশ মোতাবেক এন্টিআরসি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগের বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার বিবেচনা করে দেখতে পারে।	ঘন্টামেয়াদি
১৪.১৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনঃ দূর্গম পার্বত্য এলাকার শিশুদের প্রতিদিন ৫-১০ কিলোমিটার দূর থেকে বিদ্যালয়ে আসা খুবই কঠিন। এ অবস্থা নিরসনে সরকার কয়েকটি এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার সুপারিশ বিবেচনা করতে পারে। এ ছাড়া ভি-স্যাট স্থাপন করে ইন্টারনেট সুবিধা দিয়ে অনলাইন স্কুলও পরিচালনা করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় পনেরো

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের জনপ্রশাসন সংস্কার প্রস্তাৱ

ক। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতাঃ তিনি পার্বত্য এলাকায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে বলে এলাকার নাগরিকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাধান হওয়া দরকার। নাগরিকরা বুঝতে পারে না কোন সমস্যার জন্য কার কাছে যাবে।

খ। আস্থার জায়গা জনপ্রশাসনঃ মতবিনিয়নকালে তিনি পার্বত্য জেলা ও বিভিন্ন উপজেলার বিশিষ্ট নাগরিকগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাদের কাছে সরকারি প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তাই তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এর মধ্যে জেলা প্রশাসন সবচেয়ে আস্থার জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা অনেক সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করছে। কোথাও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে জেলা প্রশাসন সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নঃ তিনি পার্বত্য জেলায় পর্যটন শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সব কাজ করতে হবে। এজন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে। এখানে পর্যটনের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। একটি মাস্টার প্লানের আওতায় পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে উন্নয়ন করতে হবে। রাঙামাটি লেক বর্জের কারণে দুষ্প্রিয় হয়ে পড়েছে। এর দ্রুত প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সাজেক ভেলিকে পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকল্প নিতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় এঙ্গো-টুরিজম উন্নয়ন করা যেতে পারে।

ঘ। ক্রীড়া উন্নয়নের সম্ভাবনাঃ উপজাতি জনগোষ্ঠির মাঝে ক্রীড়া উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ক্রীড়া উন্নয়নে বিভিন্ন দণ্ডের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে যা দূর করা দরকার। বছরে ৭টি নিয়মিত প্রতিযোগিতা ও ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য জেলা পর্যায়ে মাত্র ও জন কর্মচারী আছেন। উপজেলাগুলোতে কোনো ক্রীড়া দণ্ডের নেই।

ঙ। একদিনে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাঃ দূরবর্তী দুর্গম পার্বত্য এলাকা থেকে নাগরিকরা জেলা বা উপজেলা সদরে এসে একদিনের মধ্যে কাজ সেরে বাঢ়ি ফিরতে পারেন না। পার্বত্য হেডম্যানদের অনাপত্তি না থাকলে জমি রেজিস্ট্রি করা যায় না। কিন্তু তারা বাঙালীদের তা দিতে চায় না। ফলে তাদের ভোগান্তি হয়।

চ। পার্বত্য ভাতা বৃদ্ধি করাঃ দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা ও নানাবিধ ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হয় বিধায় তিনি পার্বত্য জেলায় কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের পার্বত্য ভাতা বাড়ানো দরকার। দুর্গম এলাকায় ভি-স্যাট-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ছ। পার্বত্য এলাকার শিক্ষা উন্নয়নঃ তিনি পার্বত্য জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নেই। বহু পদ খালি পড়ে আছে। এখানে শিক্ষক পদায়নে দারকন সদস্য হচ্ছে। দুর্গম এলাকায় কেউ যেতে চায় না। শুধু রাঙামাটি জেলাতেই ১৯০০টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। অত্র এলাকার শিক্ষক নিয়োগের জন্য এন্টিআরসি-কে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় এই এলাকা থেকে শিক্ষক নিয়োগের বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তিনি পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকায় আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অনলাইনে শিক্ষা চালু করা যেতে পারে।

জ। পার্বত্য এলাকায় কর্মকর্তা পদায়নঃ সমতল ও তিনি পার্বত্য জেলার পরিস্থিতি আলাদা প্রকৃতির। তাই কোনো কর্মকর্তাকে এখানে পদায়নের পূর্বে ওরিয়েন্টেশন দেয়া উচিত। তিনি পার্বত্য জেলায় যেন কোনো কর্মচারীকে শাস্তিমুক বদলি করা না হয়। এর ফলে তাদের কাছ থেকে সেবা পাওয়া কঠিন হয়। বরং চৌকষ অফিসারদেও চ্যালেঞ্জ কাজের জন্য পদায়ন করা উচিত।

ঝ। পরিষেবায় নাগরিকদের সম্পৃক্ষকরণঃ তিনি পার্বত্য জেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে গণগুণানীর ব্যবস্থা চালু করা উচিত। তিনি পার্বত্য জেলায় কোনো সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের আগে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তিনি পার্বত্য জেলায় সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন।

ঝ। বনভূমি সংরক্ষণঃ তিনি পার্বত্য জেলায় ৭.০০ (সাত) লক্ষ একর বনভূমি ও ভূ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ এনফোর্সমেন্ট ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। বন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নেই এবং লাইন প্রমোশন সীমিত বলে তারা অভিযোগ করেন।

ট। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ তিনি পার্বত্য জেলার দুর্গম বিভিন্ন ইউনিয়ন /ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সহকারীরা কাজ করে। তাদেরকে ৪০-৫০ কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হয় যা অত্যন্ত কঠিন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাও দেয়া যায় না। সব উপজেলায় এক্স-রে মেশিন নেই। সরকারি ব্যতীত অন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবা নেই বললেই চলে। পার্বত্য এলাকায় সাপের দুঃশন নিত্য-নেমিতিক ঘটনা। এর সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আইসিইউ বেড থাকা উচিত। জরুরিভিত্তিতে এর সুব্যবস্থা করা উচিত।

ঠ। তিন পার্বত্য জেলায় পুলিশ বাহিনীর সমস্যাঃ তিন পার্বত্য জেলায় পুলিশ বাহিনীর জনবল থাকতে চায় না। এখানকার ২৪টি ক্যাম্পের মধ্যে ১৭টিতে পানি ও বিদ্যুৎ সংকট রয়েছে। যাতায়াতের সমস্যা বেশ প্রকট। টিএ ডিএ যথেষ্ট নয়। এখানে কর্মরতদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো দরকার।

ড। সুপারিশমালাঃ

১৫.১	তিন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধনঃ তিন পার্বত্য এলাকায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে নাগরিকরা মনে করেন। এগুলো চিহ্নিত করার জন্য তিন সংস্থার মধ্যে আলোচনা করা দরকার। সমস্যা থাকলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাধান হওয়া দরকার। নাগরিকরা যেন বুঝতে পারে যে কোন সমস্যার জন্য তারা কার কাছে যাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকর্দের উদ্যোগ গ্রহনের জন্য সরকার নির্দেশনা দিতে পারেন।	স্বল্পমেয়াদি
১৫.২	রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত জনপ্রশাসনঃ তিন পার্বত্য এলাকার বিশিষ্টজনেরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। এ এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জনপ্রশাসনকে গতিশীল করতে হবে। তিন পার্বত্য জেলার সকল জেলা প্রশাসকের একই ধরণের ক্ষমতা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এসব জেলার ডিপুটি কমিশনারদের প্রটোকল কাজে বেশ সময় যাতে দিতে না হয় সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১৫.৩	পর্যটন শিল্পের বিরাট সম্ভাবনাঃ তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় তাকে অধ্যাধিকার দিয়ে একটি মাস্টার প্লানের আওতায় পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন করতে হবে। রাঙামাটি লেক বর্জের কারণে দৃষ্টিত হয়ে পড়েছে; এর দ্রুত প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হলো। সাজেক ভেলিকে পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকল্প নিতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১৫.৪	ক্রীড়া উন্নয়নঃ উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রীড়া উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় সেখানকার ক্রীড়া উন্নয়নে বিভিন্ন দণ্ডের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে। বছরে ৭টি নিয়মিত প্রতিযোগিতা ও ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য জেলা পর্যায়ে মাত্র কর্মচারী সংখ্যা বাড়াতে হবে।	মধ্যমেয়াদি
১৫.৫	সরকারি কর্মচারীদের পার্বত্য ভাতাঃ দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা ও নানাবিধি বুঁকির মধ্যে কাজ করতে হয় বিধায় তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের পার্বত্য ভাতা বাড়ানোর সুপারিশ করা হলো। সমতল ও তিন পার্বত্য জেলার পরিস্থিতি আলাদা প্রকৃতির। তাই কোনো কর্মকর্তাকে এখানে পদায়নের পূর্বে ওরিয়েটেশন দেয়া উচিত। তিন পার্বত্য জেলায় যেন কোনো কর্মচারীকে শাস্তিমূলক বদলি করা না হয়। এর ফলে তাদের কাছ থেকে সেবা পাওয়া কঠিন হয়। বরং অধিকতর যোগ্য ও চৌকষ কর্মকর্তাদেরকে চ্যালেঞ্জিং কাজের জায়গায় পদায়ন করা উচিত।	মধ্যমেয়াদি
১৫.৬	শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণঃ শুধু রাঙামাটি জেলাতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এনটিআরসি-কে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় উক্ত এলাকা থেকে শিক্ষক নিয়োগের বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করা হলো। তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকায় আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হলো।।	মধ্যমেয়াদি
১৫.৭	ভি-স্যাট-এর মাধ্যমে ইন্টারনেটঃ দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ভি-স্যাট-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখানে অনলাইন শিক্ষা চালু করা যেতে পারে।	মধ্যমেয়াদি
১৫.৮	গণশুননীর ব্যবস্থাঃ তিন পার্বত্য জেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুননীর ব্যবস্থা চালু করা উচিত। তিন পার্বত্য জেলায় কোনো সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের আগে লক্ষ্যত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তিন পার্বত্য জেলায় সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা উচিত।	মধ্যমেয়াদি
১৫.৯	বনভূমি ও ভূ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণঃ তিন পার্বত্য জেলায় ৭.০০ (সাত) লক্ষ একর বনভূমি ও ভূ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ এনকোর্সমেন্ট ক্ষমতা বাড়ানো দরকার।	মধ্যমেয়াদি
১৫.১০	স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নঃ তিন পার্বত্য জেলার উপজেলাগুলোর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক্স-রে মেশিনসহ জরুরি চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি
১৫.১১	ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহঃ দুর্গম পার্বত্য এলাকায় গর্ভবতী মা ও জরুরি রোগীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করার জন্য সুপারিশ করা হলো। পার্বত্য এলাকায় সাপের দংশন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এর সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আইসিইউ বেড থাকা উচিত। জরুরিভিত্তিতে এর সুব্যবস্থা করা উচিত।	মধ্য মেয়াদি
১৫.১২	পুলিশ বাহিনীর সমস্যা দূরীকরণঃ তিন পার্বত্য জেলায় পুলিশ বাহিনীর যাতায়াতের সমস্যা, টিএ-ডিএ ও অন্যান্য অসুবিধাগুলো প্র্যালোচনা করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো।	মধ্যমেয়াদি

অধ্যায় ঘোল

জনপ্রশাসনে নারীবান্ধব কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতে সংস্কার প্রস্তাৱ

ক। জনপ্রশাসনে নারী-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিৎ সরকারের বিভিন্ন দণ্ডে এখন প্রচুর সংখ্যক নারী কৰ্মরত রয়েছে। তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। কমিশন মনে করে যে, প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও তার অধিনস্ত অফিসগুলোতে নারী-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদারকীর জন্য একজন নারী অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা উচিত।

খ। অবদলিযোগ্য পদে নারীদের নিয়োগৎ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা সংসারমুখী হয়ে থাকে। চাকরিজীবি নারীদের জন্য বদলিযোগ্য চাকরী করা বেশ চ্যালেঞ্জ। পরিবাবের সুবিধার কথা বিবেচনা করে অনেক নারী বদলিৰ কারণে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাৰা একই স্থানে চাকরি কৰতে পাৱলে একুপ অসুবিধা এড়ানো যেতে পাৱে। তাই অবদলিযোগ্য পদে নারীদের নিয়োগে অঞ্চাধিকার দেওয়া উচিত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের অনেক শূন্যপদ এজন্য উপযোগী হতে পাৱে।

গ। থানায় মহিলা এএসআই নিয়োগৎ সমাজে মহিলাদের উপৰ অবিচার ও নির্যাতনের ঘটনা কম নয়। কিন্তু এৰ প্রতিকাৰের জন্য অনেক সময় থানায় যেয়ে পুলিশেৰ কাছে মামলা বা অভিযোগ কৰাৰ ব্যাপারে মহিলারা স্বাচ্ছন্দ বোধ কৰে না। এ সমস্যা সমাধানেৰ জন্য প্রতিটি থানায় মহিলা কৰ্মকৰ্ত্তা নিয়োগ কৰা উচিত।

ঘ। জেলা মহিলা অধিদণ্ডে জনবল বৃদ্ধি কৰাঃ মাঠ পৰ্যায়ে জেলা মহিলা অধিদণ্ডেৰ অনেক কাজ কৰতে হয়। কিন্তু জনবলেৰ অভাৱ ও নিজৰ যানবাহন না থাকায় মহিলা কৰ্মকৰ্ত্তাদেৰ অনেক ভোগাণ্ঠি পোহাতে হয়। জেলা ও উপজেলা পৰ্যায়েৰ মহিলা দণ্ডেৰ আৱো জনবল দিয়ে শক্তিশালী কৰা দৰকার।

ঙ। উপজেলা পৰ্যায়ে সরকাৰি কৰ্মকৰ্ত্তা/কৰ্মচাৰীদেৰ থাকাৰ জন্য বাসস্থানৎ উপজেলা পৰ্যায়ে সরকাৰি কৰ্মকৰ্ত্তা/কৰ্মচাৰীদেৰ বিশেষ কৰে মহিলাদেৰ থাকাৰ জন্য বাসস্থান সংকট রয়েছে। বিষয়টিৰ প্রতি সরকাৰ গুৰুত্ব দিয়ে বাজেট বৃদ্ধি কৰতে পাৱেন।

চ। সুপারিশমালাঃ জনপ্রশাসনে নারীবান্ধব কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতে সংস্কার প্রস্তাৱ

১৬.১	সকল মন্ত্রণালয়ে নারী মহাদাৰ রক্ষা অফিসার নিয়োগৎ প্রতিমন্ত্রণালয়/বিভাগে একজন কৰে মহিলা অফিসারকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে তাকে তাৰ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্ত অধিদণ্ডেৰ ও মাঠ পৰ্যায়েৰ অফিসমূহে কৰ্মজীবি নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিৰ কাজ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দেওয়াৰ জন্য সুপারিশ কৰা হলো। তিনি কোনো ধৰনেৰ লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক সংক্ৰান্ত কোনো অভিযোগ পেলে তা মন্ত্রণালয়েৰ সচিব ও মহিলা অধিদণ্ডেৰ লিখিতভাৱে অবিহিত কৰবেন।	মধ্যমেয়াদি
১৬.২	অবদলিযোগ্য পদে নারীদেৰ নিয়োগৎ যে সকল অফিসে অবদলিযোগ্য পদ রয়েছে সেখানে মহিলাদেৰ নিয়োগে অঞ্চাধিকার প্রদানেৰ জন্য সুপারিশ কৰা হলো। এৰ ফলে মহিলারা নিজ সত্তান ও পরিবাবেৰ প্রতি একটু স্বত্তিৰ সাথে চাকৰি এবং পৰিবাৰৰ ব্যবস্থাপনা কৰতে পাৱেন বলে আশা কৰা যায়।	মধ্যমেয়াদি
১৬.৩	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেৰ শূন্যপদে নারীদেৰ নিয়োগে অঞ্চাধিকার প্রদানৎ চকিৎসা ও শিক্ষা খাতে নারীদেৰ বিশেষ গুণাবলীকে মূল্যায়ন কৰে সাধাৱণ বিধানকে শিথিল কৰে হলেও অঞ্চাধিকার ভিত্তিতে নারীদেৰ নিয়োগেৰ ব্যবস্থা গ্ৰহণেৰ জন্য সুপারিশ কৰা হলো।	মধ্যমেয়াদি
১৬.৪	কাৱাগারে মহিলা ওয়ার্টেন নিয়োগৎ দেশেৰ কাৱাগারগুলোতে মহিলা বন্দীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিটি কাৱাগারে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা ওয়ার্টেন নিয়োগ কৰাৰ জন্য সুপারিশ কৰা হলো।	মধ্যমেয়াদি
১৬.৫	থানায় মহিলা এএসআই নিয়োগৎ দেশেৰ প্রতিটি থানায় একজন কৰে মহিলা এএসআই নিয়োগ কৰাৰ জন্য সুপারিশ কৰা হলো। এৰ ফলে মহিলারা স্বাচ্ছন্দে তাদেৰ অভিযোগ দায়েৰ ও প্রতিকাৰে থানায় যেতে স্বাচ্ছন্দ বোধ কৰবে।	মধ্যমেয়াদি
১৬.৬	জেলা মহিলা অধিদণ্ডে জনবল বৃদ্ধি কৰাঃ জেলা মহিলা অধিদণ্ডে জনবল বৃদ্ধি এবং জেলা পৰ্যায়ে যানবাহন সুপারিশ কৰা হলো।	মধ্যমেয়াদি
১৬.৭	উপজেলা পৰ্যায়ে সরকাৰি কৰ্মকৰ্ত্তা/কৰ্মচাৰীদেৰ বাসস্থানৎ উপজেলা পৰ্যায়ে সরকাৰি কৰ্মকৰ্ত্তা/কৰ্মচাৰীদেৰ বিশেষ কৰে মহিলাদেৰ থাকাৰ জন্য বাসস্থান সংকট রয়েছে। বিষয়টিৰ প্রতি সরকাৰ গুৰুত্ব দিয়ে বাজেট বৃদ্ধি কৰাৰ জন্য সুপারিশ কৰা হলো।	মধ্যমেয়াদি
১৬.৮	মহাসড়কেৰ পেট্রোল-পাম্পগুলোতে স্বাস্থ্যস্থৰত টয়লেটৎ বৰ্তমানে যদিও মহাসড়কেৰ পেট্রোল-পাম্পগুলোতে টয়লেট রয়েছে; কিন্তু সেগুলো স্বাস্থ্যস্থৰত বা পৰিকল্পনা থাকে না। অনেক জায়গাতেই মহিলাদেৰ জন্য আলাদা টয়লেট নেই। বিষয়টি গুৰুত্বেৰ সাথে বিবেচনা কৰে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়াৰ জন্য সুপারিশ কৰা হলো।	স্বল্পমেয়াদি

অধ্যায় সতেরো

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের কৌশল

ক। পূর্বেকার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণঃ ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ২৫টি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেসব কমিশন বা কমিটির খুব কম সংখ্যকের সুপারিশই আলোর মুখ দেখেছিল বা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল। এর মূল কারণ, (১) সেসব কমিশন বা কমিটির সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের সঠিক কৌশল না থাকা, (২) সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো ও লোকবল না থাকা, (৩) রাজনৈতিক সরকার কর্তৃক সংস্কারের কর্মসূচি বা সুপারিশসমূহকে ধারণ (own) না করা, এবং (৪) অধিকাংশ সরকারি আমলাদের সংস্কারের বিষয়ে অনীহা বা বিরোধিতা।

খ। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশের কৌশলঃ জনপ্রশাসন সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। জনপ্রশাসন কোনো ছিল (static) ব্যবস্থা নয়, এটি একটি সর্বদা গতিশীল (dynamic) ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ভূমিকা এবং সময়ে সময়ে নাগরিকদের চাহিদা ও সেবার প্রকৃতিতে পরিবর্তনের ফলে জনপ্রশাসনের পুরাতন কাঠামো ও পদ্ধতিতে সংস্কার এবং নতুন কাঠামো ও পদ্ধতি সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে কোনো একটি সংস্কার কমিশনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ (monitoring) ও তদারকীর জন্য মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি ‘সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশন’ বা অনুরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। আবার অনেক দেশে জনপ্রশাসন কাঠামো, পদ্ধতি এবং কর্ম প্রক্রিয়াতে (business process) ক্রমাগতভাবে উন্নৱন বা পরিবর্তনের জন্য স্থায়ী সংস্কার কমিশন কাঠামো রয়েছে। যেমন, ভারতে পারসোনেল (Personnel) মন্ত্রণালয়ের অধীনে এরপ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার নাম ‘ডিপার্টমেন্ট অব এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরম এন্ড পাবলিক হিভাসেস’ (Department of Administrative Reform and Public Grievances), মালয়েশিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে যে স্থায়ী সংস্কার কমিশন রয়েছে তার নাম ‘মালয়েশিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ মডার্ণাইজেশন এন্ড প্লানিং ইউনিট’ (Malaysian Administrative Modernization and Planning Unit); জাপানে এ কাজের দায়িত্বে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ‘হেড কোয়ার্টারস্ ফর এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরম’ (Headquarters for Administrative Reform); যুক্তরাজ্যে প্রশাসনিক সংস্কারের কাজে দীর্ঘদিনের জন্য ‘এফিসিয়েসি ইউনিট’ (Efficiency Unit) গঠন করা হয়েছিল; যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের শাসনকালে প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের নেতৃত্বে প্রথমে ‘ন্যাশনাল পারফরমেন্স রিভিউ’ (National Performance Review) নামে একটি কর্মসূচি (program) এবং পরে ‘ন্যাশনাল পার্টনারশীপ ফর রিইনবেন্টিং গভর্নেন্ট’ (National Partnership for Reinventing Government) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছিল।

গ। প্রস্তাবিত স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কাজের পরিধিঃ এই কমিশন বাংলাদেশে একটি ছোট স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনের জন্য সুপারিশ করেছে। এই স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে এই সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, সংস্কার বাস্তবায়ন প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করা এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে ক্রমাগতভাবে টেকনিকাল সহায়তা প্রদান করা। এ লক্ষ্যে স্থায়ী সংস্কার কমিশন প্রথমেই এই সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবে। দ্বিতীয়ত, সময়ের স্বল্পতার কারনে এই কমিশন যেসব সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে নাই, সেগুলো এবং অন্যান্য নতুন নতুন উন্নাবনী সংস্কার নিয়ে প্রস্তাবিত স্থায়ী সংস্কার কমিশন কাজ করতে পারে। বিশেষ করে সরকারি বিভাগের/দপ্তরের জনবলের যৌক্তিকীকরণ এবং সরঞ্জামের তালিকা হালনাগাদকরণ একটি দীর্ঘদিনের মূলতবি বা অনিষ্টন্ত কাজ। সরকারি বিভাগ ও দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি কর্পোরেশন ও কোম্পানীর পুনর্গঠনসহ সকল প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক বা কাঠামোগত সংস্কার, যেমন বিলুপ্তি, একাত্মিকরণ, বেসরকারিকরণ নিয়েও প্রস্তাবিত স্থায়ী সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশন কাজ করতে পারে।

ঘ। প্রস্তাবিত স্থায়ী সংস্কার কমিশনের কাঠামোঃ প্রস্তাবিত ‘জনপ্রশাসন সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশন’ পাঁচজন কমিশনার নিয়ে গঠিত হতে পারে এবং তাদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রস্তাবিত এই কমিশনের চেয়ারম্যানের পদবৰ্যাদা হবে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতে পদবৰ্যাদার এবং চারজন কমিশনারের পদবৰ্যাদা সরকারের মুখ্য সচিবের পদবৰ্যাদার সমান হতে পারে। এই চারজন কমিশনারের জনপ্রশাসন বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাদের মধ্যে একজন একাডেমিশিয়ন (academician) বা শিক্ষাবিদ এবং একজন বেসরকারি খাতের হওয়া সমীচীন। স্থায়ী কমিশনের সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন সমষ্টি ও সংস্কার বিভাগের সচিব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ‘সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশনকে’ সকল প্রকার সাচিবিক, আর্থিক, অফিস স্থাপন এবং লজিস্টিক্স সহায়তা প্রদান করবে। কমিশনের কাজে সমষ্টি ও সহায়তা করার জন্য সরকার দুইজন উপসচিব / সমর্পণায়ের কর্মকর্তা কমিশনের নিকট ন্যস্ত করবে। কমিশন সংস্কার বিষয়ে গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য সর্বোচ্চ দুইজন পরামর্শক (consultant) নিয়োগ করতে পারবে। এছাড়া কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য একজন কম্পিউটার অপারেটর, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং একজন এমএলএসএস নিয়োগ দিতে হবে।

এই স্থায়ী সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশন গঠনের কাজ অন্তর্ভুক্তালীন সরকারের আমলেই সম্পন্ন করা সমীচীন হবে। একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রস্তাবিত স্থায়ী সংস্কার কমিশন গঠন করা যেতে পারে। কমিশনের ব্যয়ভার বহনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে অপারেটিং বা অনুন্নয়ন বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্ব দিতে হবে এবং এই বিষয়টি স্থায়ী সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশন গঠনের আদেশে উল্লেখ থাকতে পারে। এ উদ্দেশ্যে অর্থ বিভাগ সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট কোড খুলবে।

কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য কেবিনেট সচিবের নেতৃত্বে একটি সচিব কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই সচিব কমিটির অন্য সচিবরা হবেন অর্থ সচিব, আইন সচিব, জনপ্রশাসন সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমষ্টি ও সংস্কার বিভাগের সচিব।

জনপ্রশাসন সংস্কার বাস্তবায়ন কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা / প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি ‘জাতীয় জনপ্রশাসন সংস্কার পরিষদ’ (National Council for Public Administration Reforms) গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশনের অন্য সদস্যদের মধ্যে থাকবেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রী, বিরোধী দলের একজন এমপি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব, অর্থ সচিব, জনপ্রশাসন সচিব, আইন সচিব, এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি এবং সিভিল সোসাইটির একজন প্রতিনিধি। এই জাতীয় জনপ্রশাসন সংস্কার পরিষদ বছরে দুইবার সভা করবে এবং জনপ্রশাসনের সংস্কারের অগ্রগতি পর্যালেচনা করবে এবং সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিষদের সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

উপসংহার

ক। জনপ্রশাসনের রূপকল্প (Vision), মূলনীতি (Core Values) ও লক্ষ্য (Goals) সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণের পর সরকারি কর্মচারীদের যদি উদ্বৃদ্ধ ও প্রশিক্ষিত করে একটি নতুন প্রশাসনিক সংস্কৃতি চালু করা যায়, তাহলে জনপ্রশাসনে কাঞ্চিত সুফল পাওয়া যাবে। একটি স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হলে সংস্কার কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারবে।

খ। জনপ্রশাসনের মৌলিক নীতি বিশেষ করে জনবান্ধব, নিরপেক্ষ, জবাবদিহি, স্বচ্ছ, নেতৃত্বিক, দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের সময় তাদের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে কাঞ্চিত সুফল পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন যাবত ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে যে জনপ্রশাসন ব্যবস্থা ভারত উপমহাদেশে বিদ্যমান ছিল তার ধারাবাহিকতায় আমলাতন্ত্রে জনসেবার পরিবর্তে জনগণকে শাসন করার মনোবৃত্তি কমবেশি এখনো বহাল আছে। যে কোনো সংস্কারের কার্যকর করতে হলে কর্মচারী ও রাজনীতিবিদ উভয়েরই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে। উপরের অনুচ্ছেদে সংস্কারের যে রূপকল্প, মৌলিক নীতি ও লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি জনপ্রশাসন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের মধ্যে অনুগ্রহিত করা যায়, তাহলে সংস্কারের কাঞ্চিত সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। যুক্তরাজ্যের সিভিল সার্ভিস কোডে সততা, নিরপেক্ষতা, বন্তনিষ্ঠতা, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে জনপ্রশাসনের মূল্যবোধ হচ্ছে: সততা, সেবা, উৎকর্ষতা ও দলগত কাজ। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের মূল্যবোধ হিসেবে নাগরিক সেবা, উন্নতমানের কার্যসম্পাদন, কার্যকর সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নির্ধারণ করা হলে কাঞ্চিত সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

গ। নাগরিক পরিষেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের সম্পৃক্তি করার হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ ও নাগরিকদের সাথে জনপ্রশাসনের অধিকতর সংযোগ স্থাপন কাঞ্চিত সুফল দেবে বলে আশা করা যায়। নাগরিক সুবিধা দ্রুততর দেওয়া ও দূর্নীতি দূর করার জন্য সমন্বিত ডিজিটাল প্লাটফর্ম কার্যকর সুবিধা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

ঘ। বিগত ৫৩ বছরে সরকারের মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ১৫ থেকে ৩৬-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। একই বিষয়ে একাধিক মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। এর ফলে একদিকে সরকারের ব্যয় বেড়েছে এবং অপরদিকে, জনপ্রশাসনের কাজের মাত্রা ও দক্ষতাও কমেছে। অতীতের সংস্কার কমিশনগুলোও মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা হ্রাস করার সুপারিশ করেছে। যদি একই বা কাছাকাছি কাজের ধরন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়গুলোকে যদি কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করা হয় এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সার্ভিস ও বিষয়ের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয় তাহলে তাদের পক্ষে ক্ষয়িয়ার প্লানিং করে বিশেষজ্ঞ হওয়া সহজতর হবে এবং মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের নেপুন্যতা বৃদ্ধি পাবে। সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও সরকারি ব্যবস্থাপনায় যে সব চ্যালেঞ্জ রয়েছে এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির চাহিদাপূরণে পরিষেবা প্রদান করাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। রাজধানী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ও পরিষেবার ব্যাপ্তির কথা বিবেচনায় রেখে এখানে মেট্রোপলিটান গভর্নমেন্ট গঠনের আলোচনাও রয়েছে। এমতাবস্থায় দেশকে পুরাতন চারটি বিভাগকে চারটি প্রদেশ এবং রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্রস্থানিত এলাকা হিসেবে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে জনদাবির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে মোট ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগ গঠনের দাবি অনেক দিনের। ভৌগোলিক ও যাতায়াতের বিবেচনায় কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করা যেতে পারে।

ঙ। ক্যাডার সার্ভিস কমিসন্ট বাদ দিয়ে সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন সার্ভিসের নতুন নামকরণ এবং প্রস্তাবিত ‘সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হলে বিভিন্ন সার্ভিসের মধ্যে সমতা আনায়ন করা যাবে বলে আশা করা যায়। অপরদিকে, সিনিয়র সচিবের পরিবর্তে মুখ্য সচিব পদ চালু করা হলে পদবি ও মর্যাদার যৌক্তিকতা ও সাযুজ্য আসবে বলে আশা করা যায়।

চ। প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে সরকারি সেবার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর হবে। উন্নত সেবা মান ও নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করবে। ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সেবার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করবে। প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। সামগ্রিকভাবে, এই উদ্যোগগুলি আরও কার্যকর ও সংবেদনশীল শাসন কাঠামো গড়ে তুলবে, যা নাগরিকদের আঙ্গ ও অংশগ্রহণ বাড়াবে।

চ। প্রস্তাবিত সংক্ষারের ফলে সরকারি সেবার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর হবে। উন্নত সেবার মান ও নাগরিক সম্মতি বৃদ্ধি করবে। ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সেবার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করবে। প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও কর্মক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। সামগ্রিকভাবে, এই উদ্যোগগুলো আরও কার্যকর ও সংবেদনশীল শাসন কাঠামো গড়ে তুলবে, যা নাগরিকদের বিশ্বাস ও অংশগ্রহণ বাঢ়াবে।

জ। আমলাতাত্ত্বিক কর্মপ্রক্রিয়া সহজ ও গতিশীল করা, কার্য সম্পাদনে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রয়োগ, কর্মচারীদের কার্যসম্পাদনে উৎকর্ষতা আনার জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিকরণ নীতি, পরিমেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোগন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জেলা ও উপজেলার সাথে কেন্দ্রের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব হলে নাগরিক পরিমেবা সম্মতিজনক ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ঝ। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) গঠন করার ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি সুসংহত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে। এ কমিশনটি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার ও প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের দ্বারা গঠিত হবে, যা পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাপনায় বিপুল পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে।

ঞ। স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর জনবান্ধব, যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা এখন সময়ের দাবি। এজন্য স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনবল তৈরি করা এবং মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে রোগীদের সেবার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যাপক সংক্ষার করা প্রয়োজন। যেহেতু স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন কাজের সাথে জনপ্রশাসনের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে সেহেতু এ কমিশন স্বাস্থ্য খাতের সংক্ষারের জন্য কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা জরুরি বিবেচনা করছে।

ট। ‘বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস-এ’ জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি পরীক্ষা ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য আলাদা একটি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করার সুপারিশ করা হলো। বিষয়টি নিয়ে পুর্খান্তপুঁথকুপে আলোচনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি টাঙ্কফোর্স গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা এই প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে তা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

(সীমিত পরিসরের জন্য মূল প্রতিবেদনের ১-৪ পর্যন্ত সংযুক্তি এই সংক্ষিপ্ত ভার্সনে রাখা হয়নি)

সংযুক্তি-৫

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুনর্বিন্যাস প্রস্তাব

ক্রমিক	মন্ত্রণালয় ও সরকারি দায়িত্বশীল	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	মন্ত্রণালয় সংখ্যাঃ	২৭ টি	রাষ্ট্রপতি সচিবালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংখ্যাঃ	৪৫ টি	
৩.	মন্ত্রীর সংখ্যাঃ	২৩ জন	দু'জন টেকনোক্রাট মন্ত্রীসহ
৪.	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী সংখ্যাঃ	১২ জন	
৫.	কেবিনেট সেক্রেটারিঃ	০১ জন	
৬.	প্রিসিপাল সেক্রেটারিঃ	১৭ জন	একাধিক বিভাগ সংযুক্ত মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য একজন প্রিসিপাল সেক্রেটারী থাকতে পারে।
৭.	সচিব/সেক্রেটারি	৪২ জন	

ক্রমিক	বিদ্যমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দায়িত্ব বণ্টন	প্রিসিপাল সেক্রেটারি/ সচিব
১.	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ঃ (ক) আপন বিভাগ (খ) জনবিভাগ	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ঃ (ক) আপন বিভাগ (খ) জনবিভাগ	রাষ্ট্রপতি	প্রিসিপাল সেক্রেটারী
২.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ (ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	প্রধানমন্ত্রী	কেবিনেট সেক্রেটারি প্রিসিপাল সেক্রেটারি
৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কার্যক্রম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত/অর্পণ করা যেতে পারে) পাদটীকা দ্রষ্টব্যঃ	প্রধানমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি মিলিটারী সেক্রেটারি
৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	প্রধানমন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	একজন সচিব
৫.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ক) আইন ও বিচার বিভাগ (খ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (গ) সংসদ সচিবালয়	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ক) আইন ও বিচার বিভাগ (খ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (গ) সংসদ সচিবালয়	একজন মন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি তিনজন সচিব

ক্রমিক	বিদ্যমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দায়িত্ব বচ্টন	প্রিসিপাল সেক্রেটারি/ সচিব
৬.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ঃ (ক) জননিরাপত্তা বিভাগ (খ) সুরক্ষা বিভাগ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	একজন মন্ত্রী	একজন সচিব
৭.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	একজন মন্ত্রী	একজন সচিব
৮.	অর্থ মন্ত্রণালয়ঃ (ক) অর্থ বিভাগ (খ) অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (গ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	অর্থ মন্ত্রণালয়ঃ (ক) অর্থ বিভাগ (খ) অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (গ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল ফাইন্যান্স সেক্রেটারী তিনজন সচিব
৯.	(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় (খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (গ) পাট ও বন্ধ মন্ত্রণালয়	শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ (ক) শিল্প বিভাগ (খ) পাট ও বন্ধ বিভাগ (গ) বাণিজ্য বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
১০.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ঃ (ক) পরিকল্পনা বিভাগ (খ) আইএমইডি বিভাগ (গ) পরিসংখ্যান বিভাগ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ঃ (ক) পরিকল্পনা কমিশন (বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হবে। তারা শুধু সামষ্টিক অর্থনৈতিক পলিসি সম্পর্কে পরামর্শ দিবে) (খ) আইএমইডি বিভাগ (গ) পরিসংখ্যান বিভাগ	একজন টেকনোক্রাট মন্ত্রী	একজন সচিব
১১.	(ক) সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয় (খ) রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ (ক) সড়ক যোগাযোগ বিভাগ (খ) সেতু বিভাগ (গ) রেলওয়ে বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি তিনজন সচিব
১২.	(ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (খ) অসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	নৌপরিবহন ও অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ঃ (ক) নৌপরিবহন বিভাগ (খ) অসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব

ক্রমিক	বিদ্যমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দায়িত্ব বচ্চন	প্রিসিপাল সেক্রেটারি/ সচিব
১৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ (ক) বিদ্যুৎ বিভাগ (খ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ (ক) বিদ্যুৎ বিভাগ (খ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
১৪.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ঃ (ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ (খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ (ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ (খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
১৫.	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ঃ (ক) স্বাস্থ্য বিভাগ (খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ঃ (ক) স্বাস্থ্য বিভাগ (খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
১৬.	(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (খ) প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ (ক) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ (খ) মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ (গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি তিনজন সচিব
১৭.	(ক) তথ্য মন্ত্রণালয় (খ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ঃ (ক) তথ্য বিভাগ (খ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
১৮.	(ক) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ঃ (ক) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (খ) বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগ	একজন টেকনোক্রাট মন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
১৯.	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয় (খ) মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ (ক) কৃষি বিভাগ (খ) মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগ	একজন মন্ত্রী একজন প্রতিমন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব

ক্রমিক	বিদ্যমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দায়িত্ব বচ্টন	প্রিসিপাল সেক্রেটারি/ সচিব
২০.	(ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (খ) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	ভূমি, পানি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ঃ (ক) ভূমি বিভাগ (খ) পানি সম্পদ বিভাগ (গ) বন ও পরিবেশ বিভাগ	একজন মন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
২১.	(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় (খ) আন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	খাদ্য, আণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ঃ (ক) খাদ্য বিভাগ (খ) আন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ	একজন মন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি দুইজন সচিব
২২.	পার্বত্য চট্টগাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পার্বত্য চট্টগাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	একজন মন্ত্রী	সচিব
২৩.	(ক) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ (ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভাগ (খ) সমাজ কল্যাণ বিভাগ (গ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ	একজন মন্ত্রী	প্রিসিপাল সেক্রেটারি তিনজন সচিব
২৪.	(ক) শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় (খ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ঃ (ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিভাগ (খ) শ্রম ও জনশক্তি বিভাগ	একজন মন্ত্রী	একজন সচিব
২৫.	পূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়	পূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়	একজন মন্ত্রী	একজন সচিব
২৬.	(ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	একজন মন্ত্রী	একজন সচিব
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	একজন মন্ত্রী	একজন সচিব

পাদটীকাঃ (ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বাতিল করতঃ এর কার্যক্রম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত/অর্পণ করা যেতে পারে। (খ) আন্তঃসার্ভিস সময়য়ের জন্য সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানদের সময়য়ে ‘জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ’ নামে একটি বোর্ড ও সচিবালয় গঠন করা যেতে পারে। তিনি বাহিনী প্রধান প্রতি বছর আবর্তক ভিত্তিতে এ বোর্ডের সভাপতি হবেন। এ ছাড়া স্ব স্ব বাহিনীর পদোন্নতি নিজস্ব পদোন্নতি বোর্ডের মাধ্যমে হবে। এ ছাড়া স্ব স্ব বাহিনীর পদোন্নতি নিজস্ব পদোন্নতি বোর্ডের মাধ্যমে হবে। তবে ব্রিগেডিয়ার/সমমান ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের পূর্বানুমতি নিতে হবে।

সংযুক্তি-৬
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন গুচ্ছে বিভক্তিকরণ

ক্রমিক	ক্লাস্টার পরিচয়	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
১.	বিধিবদ্ধ প্রশাসন	১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৪. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৬. ভূমি মন্ত্রণালয় ৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮. তথ্য মন্ত্রণালয় ৯. আইন, বিচার ও সংবিধান বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০. পরৱর্ত্তী মন্ত্রণালয় ১১. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
২.	অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য	১. অর্থ মন্ত্রণালয় ২. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৩. শিল্প মন্ত্রণালয় ৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩.	ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগ	১. যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ২. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয় ৪. বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫. তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬. গণপৃষ্ঠ ও নগরায়ন মন্ত্রণালয় ৭. ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৪.	কৃষি ও পরিবেশ	১. কৃষি মন্ত্রণালয় ২. জ্বালানী সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৩. মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ৪. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫. বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
৫.	মানব সম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন	১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৪. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮. শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

সংযুক্তি-৭



সংযুক্তি-৮

বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস পুনর্গঠন প্রস্তাব

	বিদ্যমান সিভিল সার্ভিসসমূহ	প্রস্তাবিত সার্ভিস	প্রস্তাবিত সার্ভিসের কাঠামো
	১. বিসিএস (প্রশাসন) ২. বিসিএস (খাদ্য) ৩. বিসিএস (সমবায়)	১। বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস	বিসিএস (খাদ্য) ও বিসিএস (সমবায়) সার্ভিস দু'টো বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসের সাথে একীভূত হবে। ভবিষ্যতে এ দু'টো সার্ভিসে আর নিয়োগ হবে না।
	বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস	২। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস	অপরিবর্তিত থাকবে।
	বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সার্ভিস	৩। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সার্ভিস	অপরিবর্তিত থাকবে।
	১. বিসিএস (পুলিশ) ২. বিসিএস (আনসার ও ভিডিপি)	৪। বাংলাদেশ পাবলিক সিকিউরিটি সার্ভিস	বাংলাদেশ পাবলিক সিকিউরিটি সার্ভিস -এর দুটি উপ-সার্ভিস থাকবে: ক) বিপিএসএস (পুলিশ) খ) বিপিএসএস (আনসার ও ভিডিপি)
	১. বিসিএস (কর) ২. বিসিএস (কাস্টমস ও ভ্যাট)	৫। বাংলাদেশ রাজস্ব সার্ভিস	বিসিএস (ট্রেড) সার্ভিস বিলুপ্ত হবে এবং বাংলাদেশ রাজস্ব সার্ভিস (কাস্টমস ও ভ্যাট)-এর সাথে একীভূত হবে। ভবিষ্যতে এ সার্ভিসে আলাদা কোনো নিয়োগ হবে না। বাংলাদেশ রাজস্ব সার্ভিস-এর দুটি উপ-সার্ভিস থাকবে: ক) বিআরএস (কর) খ) বিআরএস (কাস্টমস ও ভ্যাট)
	বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা)	৬। বাংলাদেশ হিসাব সার্ভিস	বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা) আলাদা দু'টো সার্ভিস হবে।
	বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা)	৭। বাংলাদেশ নিরীক্ষা সার্ভিস	বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা) আলাদা দু'টো সার্ভিস হবে
	১. বিসিএস (কৃষি) ২. বিসিএস (বন) ৩. বিসিএস (মৎস্য) ৪. বিসিএস (পশু সম্পদ)	৮। বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিস	বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিস-এর চারটি উপ-সার্ভিস থাকবে: ক) বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিস (কৃষি) খ) বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিস (বন ও পরিবেশ) গ) বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিস (মৎস্য) ঘ) বাংলাদেশ কৃষি সার্ভিস (পশু সম্পদ)

	বিদ্যমান সিভিল সার্ভিসসমূহ	প্রস্তাবিত সার্ভিস	প্রস্তাবিত সার্ভিসের কাঠামো
	১. বিসিএস (গণপূর্ত) ২. বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল) ৩. বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	৯। বাংলাদেশ প্রকৌশল সার্ভিস	বাংলাদেশ প্রকৌশল সার্ভিস-এর তিনটি উপ-সার্ভিস থাকবে: ক) বাংলাদেশ প্রকৌশল সার্ভিস (গণপূর্ত) খ) বাংলাদেশ প্রকৌশল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ) গ) বাংলাদেশ প্রকৌশল সার্ভিস (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল) উল্লেখ্য যে, এলজিইডির প্রকৌশলীরা বিসিএস (জনস্বাস্থ্য)-এর সাথে একীভূত হবে এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল সার্ভিস (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল) হিসেবে নামকরণ হবে।
	১. বিসিএস (ডাক) ২. বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ৩. বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল)	১০। বাংলাদেশ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সার্ভিস (বিআইসিটি)	ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে ও অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে কর্মরত আইসিটি অফিসারগণ প্রস্তাবিত নতুন সার্ভিসে যুক্ত হবে। গ) বাংলাদেশ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সার্ভিস-এর দুটি চারটি উপ-সার্ভিস থাকবে: ক) বিআইসিটি সার্ভিস (টেলিযোগাযোগ) খ) বিআইসিটি সার্ভিস (তথ্য প্রকৌশল) গ) বিআইসিটি সার্ভিস (আইসিটি) ঘ) বিআইসিটি সার্ভিস (ডাক)
	১. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ২. বিসিএস (কারিগরি শিক্ষা)	১১। বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস	বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস-এর দুটি উপ-সার্ভিস থাকবে: ক) বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা) খ) বাংলাদেশ শিক্ষা সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)
	১. বিসিএস (স্বাস্থ্য) ২. বিসিএস (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ)	১২। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস	বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস-এর দুটি উপ-সার্ভিস থাকবে: ক) বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস (স্বাস্থ্য) খ) বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ)

	বিদ্যমান সিভিল সার্ভিসসমূহ	প্রস্তাবিত সার্ভিস	প্রস্তাবিত সার্ভিসের কাঠামো
	১. বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল) ২. বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্য)	১৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভিস	বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভিস এর দুটি উপ- সার্ভিস থাকবে: ক) বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল) খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্য)
	বিসিএস (তথ্য)	১৪। বাংলাদেশ তথ্য সার্ভিস	বিসিএস (সাধারণ তথ্য) ক্যাডারের অধীনে তিনটি সাব-ক্যাডারকে বিলুপ্ত করে তিনটি ফ্রপের (ক) সহকারী পরিচালক/তথ্য অফিসার/গবেষণা কর্মকর্তা, (খ) সহকারী অনুষ্ঠান পরিচালক, এবং (গ) সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক পদসমূহ নিয়ে একটি একীভূত সার্ভিস করা হবে।
	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	প্রযোজ্য নয়	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান কমিশনে উন্নীত করার প্রস্তাৰ দেওয়া হয়েছে। তারা স্বাধীনভাবে জনবল নিয়োগ করতে পারবে।

সংযুক্তি-৯

পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং বিসিএস পরীক্ষা

একটি সম্পূর্ণ বিসিএস পরীক্ষা (প্রিলিমিনারী, মূল লিখিত এবং মৌখিক) সম্পন্ন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) সময় নেয় সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার বছর। বিগত সরকারের সময় এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছিল।

এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক দুটো বিসিএস নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সূচি বা নির্ধন্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ৪১তম বিসিএস এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ২৭ নভেম্বর ২০১৯। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে (১৫) মাস পরে প্রিলিমিনারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালের মার্চ মাসে এবং এই বছরের আগস্ট মাসে এর ফল প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফল প্রকাশে পিএসসি'র সময় লেগেছিল পাঁচ (৫) মাস। প্রিলিমিনারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এমসিকিউ পদ্ধতিতে। মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয় এমসিকিউ পদ্ধতিতে এবং তারা তিন লক্ষ প্রার্থীর ফল প্রকাশ করে মাত্র তিন দিনে। সেখানে পিএসসি অনুরূপ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে সময় নেয় পাঁচ মাস।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফল প্রকাশের আট (০৮) মাস পরে ৪১তম বিসিএস এর মূল লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অতঃপর এর ফলাফল প্রকাশিত হয় ১০ নভেম্বর ২০২২ সালে। অর্থাৎ মূল লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে পিএসসি সময় নিয়েছে প্রায় এক (১) বছর। এই ৪১ তম বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয় ২০২৩ সালের জুন মাসে। অর্থাৎ মূল লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মধ্যে সময়ের ব্যবধান আঠার (১৮) মাস বা দেড় বছর। সামগ্রিকভাবে প্রিলিমিনারী, মূল লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা (দুটা পরীক্ষা) নিতেই পিএসসি'র মোট সময় লেগেছে দুই (২) বছর তিন (৩) মাস। পিএসসি ৪১তম বিসিএস এর অধীনে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে। অর্থাৎ ৪১তম বিসিএসের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ (২৭ নভেম্বর ২০১৯) হতে চূড়ান্ত চাকুরির সুপারিশ (জুলাই ২০২৩) এর তারিখের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তিন (৩) বছর আট (৮) মাস। অতঃপর প্রার্থীদের কিছু তথ্য যাচাই বাছাই করে নয় (৯) মাস পরে সরকার নিয়োগ আদেশ বা গেজেটে জারি করে গত ২১ মার্চ ২০২৪। অর্থাৎ ৪১তম বিসিএস এর সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সর্বমোট সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে চার (৪.৫) বছর।

অনুরূপভাবে ৪৩তম বিসিএস এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেও পিএসসি ও সরকার মোট সময় নিয়েছে ৪ বছর ২ মাস। এই বিসিএস এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ৩০ নভেম্বর ২০২০ এবং প্রার্থীদের যোগদানের তারিখ এখন নির্ধারিত হয়েছে ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে।

বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে বর্তমানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ব্যাকহাউন্ড যাচাই বাছাই করতে পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। এতে প্রায় নয় / দশ মাস অতিরিক্ত সময় লেগে যায়।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সূচির সাথে ভারতের সিভিল সার্ভিস নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সূচির একটা তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সেখানেও একই প্রক্রিয়ায় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলে। ভারতে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার (সিএসই) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- ২০২৩ সালের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
- প্রিলিমিনারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৮ মে ২০২৩ (একদিন)
- প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল ১২ জুন ২০২৩।
- মূল লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৫ জুন থেকে ২৪ জুন ২০২৩ (মোট পাঁচ দিন)।
- মূল লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছিল ৮ ডিসেম্বর ২০২৩।
- সর্বশেষ মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২ জানুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।
- ইউপিএসসি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে ২০২৩ সালের মে মাসে।

এরপর তাঁরা ১৪ সপ্তাহের ফাউল্ডেশন ট্রেনিং এর জন্য মুসোরীতে অবস্থিত লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একাডেমি অব এডমিনিস্ট্রেশন এ যোগদান করেন। ২০২৩ সালে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩১ জুলাই থেকে ০২ নভেম্বর পর্যন্ত।

উপরে বর্ণিত ভারতের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ও নিয়োগের সময়সূচি হতে দেখা যায় যে, তাদের ইউপিএসসি এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সিভিল সার্ভিসের সকল পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ সম্পন্ন করে। পরীক্ষাসহ সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় দেড় বছরের মধ্যে। ইউপিএসসি প্রতি বছর তাদের প্রকাশিত পঞ্জিকা অনুসারে নির্দিষ্ট তারিখে সকল পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করে এবং নির্দিষ্ট তারিখেই ফলাফল প্রকাশ করে। সেখানে তারিখের কিছু পরিবর্তন হলেও মাসের কোনো পরিবর্তন হয় না।

উপরের পরিসংখ্যান হতে এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশ পিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আয়োজনে অত্যন্ত অনেক মূল্যবান সময়ের অপচয় করছে এবং তাতে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতীর জীবনের মূল্যবান সময়, মেধা এবং শ্রমের অপচয় হচ্ছে। যে পরীক্ষা সর্বোচ্চ দেড় বছরে শেষ করা যায়, বাংলাদেশের পিএসসি তা সম্পন্ন করতে চার বছরেরও বেশি সময় নিচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পিএসসি'র সদস্য সংখ্যা ১৬ জন, অন্যদিকে ভারতীয় ইউপিএসসি'র সদস্য সংখ্যা মাত্র ৮ জন। অধিকন্ত, বাংলাদেশে প্রিলিমিনারী বিসিএস পরীক্ষায় প্রার্থীর সংখ্যা দুই (২) লক্ষ, কিন্তু ভারতে তা ১৩ লক্ষ।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) বিসিএস পরীক্ষার কোনো সময়সূচি বা পঞ্জিকা অনুসরণ করে না। পিএসসি ওয়েবসাইটে বিসিএস পরীক্ষার বা ফল প্রকাশের কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা পঞ্জিকা নেই। তাতে মনে হয় তাদের পরীক্ষা গ্রহণের যেমন কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, তেমনি পরীক্ষার ফল প্রকাশেরও কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। পিএসসি এক এক বছর ভিন্ন ভিন্ন তারিখে বিভিন্ন পরীক্ষা (প্রিলিমিনারী, মূল লিখিত এবং মৌখিক) গ্রহণ করে। পিএসসি'র ফল প্রকাশেরও কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই। পিএসসি'র সুনির্দিষ্ট বা প্রকাশিত কোনো পঞ্জিকা বা সময়সূচি না থাকায় পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বা ফল প্রকাশে বিলম্ব হলে তার জন্য তাদের কোনো দায় থাকে না বা দায় নিতে হয় না।

পৃথিবীর দীর্ঘতম নিয়োগ প্রক্রিয়া হচ্ছে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ প্রক্রিয়া। এর জন্য মূলত দায়ী তথাকথিত একটা স্থাবিনোদন প্রতিষ্ঠান-পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। বিসিএস পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা এবং ফলাফলের অনিশ্চয়তার কারণে বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থী সংখ্যাও অহেতুক বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে এর কারণে বিসিএস-এ আগ্রহী তরঙ্গ-তরঙ্গীদেরকে যে চরম মানসিক অশান্তি চাপ, দুঃস্থিতা ও ধক্কা বইতে হয়, যার একটা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিসিএস পরীক্ষার এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে শুধুমাত্র যে শিক্ষিত তরঙ্গ-তরঙ্গীদের সময়, মেধা ও শক্তির অপচয় হচ্ছে তাই নয়, পিএসসি'রও অর্থ ও শ্রমের অপচয় হচ্ছে এবং তার সামর্থ্যেও টান পড়ছে। এই কারণে পিএসসিকে একসাথে তিন চারটা বিসিএস নিয়ে ব্যন্ত থাকতে হয়। কিন্তু কোনটাই তারা সময়মত শেষ করতে পারে না।

বাংলাদেশের বিসিএস পরীক্ষার আরো একটা করুণ দিক হচ্ছে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এবং পিএসসি'র সুপারিশ পেয়েও অনেক উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নিয়োগ না দেয়া। পূর্বতন সরকারের আমলে প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক প্রার্থীকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ না দিয়ে বাধিত করা হয়েছে। সেই সরকার তার কোনো ব্যাখ্যা বা কারণ প্রার্থীদেরকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করেনি। উদাহরণস্বরূপ, ৪১তম বিসিএস-এ পিএসসি সুপারিশ করেছিল ২৫২০ প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য, আর সরকার নিয়োগ দিয়েছিল ২৪৫৩ জনকে। অর্থাৎ বিসিএস-এ উত্তীর্ণ ও পিএসসি'র সুপারিশকৃতদের মধ্য হতে ৬৭ জনকে সরকার নিয়োগই দেয়নি। দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়ে এবং বিপুল শ্রমসাধ্য ও কঠিন বিসিএস পরীক্ষার পথক্রম শেষ করে এবং ৪ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করার পর এই ৬৭ জন প্রার্থী জানতে পেরেছিল বিসিএস পাশ করেও তাঁদের চাকুরি হবার অবকাশ নেই।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার